বিদ্যালয়ে শিশু থেকে শিশুর স্বাস্থ্যশিক্ষা

শিক্ষক সহায়িকা



WBVHA
ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেল্‌থ অ্যাসোসিয়েশন

বিদ্যালয়ে শিশু থেকে শিশুর স্বাস্থ্যশিক্ষা

শিক্ষক সহায়িকা

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন
৪৮ গোরাচাঁদ রোড, কলিকাতা - ৭০০ ০১৪

WBVHA

প্রকাশক ঃ
ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন
৪৮ গোরাচাঁদ রোড, কলিকাতা - ৭০০ ০১৪
ফোন ঃ ৪৩-০১১৩

নভেম্বর ১৯৯২

প্রচ্ছদ ঃ আমিনুল আহসান

মুদ্রক ঃ রিতা প্রিন্টার, কলিকাতা - ৭০০ ০০৪

ভূমিকা

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের অগ্রগতিতেই ফুটে ওঠে দেশের অগ্রগতির উজ্বল রূপ। এই অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন সুস্থ, সবল, নীরোগ এক ঝাঁক শিশু। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাধীনতার প্রায় পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে এলেও, আমাদের দেশের বেশীর ভাগ শিশুই অপুষ্টি, অনাহার, দারিদ্র আর অপরিচ্ছন্নতার শিকার।

এই সমস্ত শিশুরা যাতে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সুস্থ ভাবে বেড়ে উঠতে পারে, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন তার বিদ্যালয় স্বাস্থ্য বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়িত করেছে এবং করে চলেছে। বিদ্যালয়ই যেহেতু আদর্শ শিক্ষার স্থান, সেইহেতু শিক্ষা শুরু করা উচিত বিদ্যালয় থেকেই। ডব্লু. বি. ভি. এইচ. এ. চায় বিদ্যালয় কেবলমাত্র শিক্ষার স্থান নয়, তা শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের প্রকৃত আশ্রয়স্থল হয়ে উঠুক। এই উদ্দ্যেশই গত কয়েক বছর ডব্লু. বি. ভি. এইচ. এ. বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় প্রকাশ করছে নানা পুস্তিকা, ম্যাগাজিন, প্যামফ্লেট, লিফলেট এবং আয়োজন করেছে বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি। প্রমানিত হয়েছে যে অপেক্ষাকৃত বড় শিশুরাই পারে ছোট শিশুদের প্রকৃত শিক্ষা দিতে। আর ছোট শিশুরও যেটি গ্রহণ করতে অসুবিধা হয় না। তাই 'শিশুর মাধ্যমে শিশুর (Child to Child) স্বাস্থ্যশিক্ষা' পৌঁছে দিতে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন উদ্যোগী হয়েছে বইটি প্রকাশ করতে। নানা শিক্ষামূলক তথ্যের সন্নিবেশে বইটি ছোটবড় সকলের কাছেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে এই আশা রাখি।

এই বই সম্পাদনায় সেন্ট্রাল হেলথ এডুকেশন ব্যুরো, নিউ দিল্লী কতৃক প্রকাশিত "চাইল্ড-টু-চাইল্ড মড্যুল" এবং বিহারীলাল কলেজ অফ হোম এন্ড সোস্যাল সায়েন্স, কলিকাতা কতৃক প্রকাশিত "শিক্ষন সহায়িকা" বই দুটি যথেষ্ঠ সাহায্য করেছে।

প্রকল্প রূপায়নের দায়িত্ব যেহেতু শিক্ষক-শিক্ষিকার, তাই তাঁদের ভূমিকা বিষয়ে এক কর্মতালিকা এবং তার ব্যবহারবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হয়েছে। বইটি শিশুদের কাছে গ্রহণীয় হলে আমাদের এ প্রয়াস সার্থক হয়ে উঠবে।

ডি. পি. পোদ্দার
এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি
ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন

বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কি এবং কেন

সভ্যতার সুযোগ সুবিধা, ব্যক্তি এবং সমাজের সার্বিক ভালোমন্দের প্রসঙ্গটি শর্তসাপেক্ষরূপে নির্ভর করে প্রকৃত শিশুশিক্ষার উপর যা অতি শৈশবকাল থেকে গড়ে ওঠে। আধুনিক সভ্যতা ব্যাপক হারে শিক্ষা দাবি করে। যে কারণে প্রায় সমস্ত উন্নত ও অনুন্নত দেশমাত্রেই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারকল্পে কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। বিদ্যালয়গামী ছাত্রছাত্রীরা শারীরিক ও মানসিক উভয়দিকেই সুস্থ সুন্দরভাবে শিক্ষাগ্রহণ করে ব্যবহারিক জীবনে যাতে কাজে লাগাতে পারে তা নিশ্চিত করা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য। সমগ্র জাতির উন্নতি তখনই সম্ভব যখন শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক পরিবেশের সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার লাভ ঘটে।

'শিশুঅধিকার বিষয়ক' আর্ন্তজাতিক ঘোষণা অনুযায়ী শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য নৈতিক এবং বিষয়গত দিকগুলি আবশ্যকীয় করতে হবে। বাড়ির পর বিদ্যালয়ই হল প্রকৃত স্থান যেখানে এরূপ নির্দেশানুযায়ী শারীরিক, বৌদ্ধিক, আবেগগত এবং সামাজিকভাবে শিশুবিকাশের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা একটি আদর্শ সুসংগঠিত দল। তাছাড়া এরা ক্রিয়াশীল। শিশুদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই অজানাকে জানার আগ্রহ থাকে। স্বাস্থ্যসম্মতভাবে জীবনধারণ করার প্রাথমিক সু-অভ্যাসগুলি এই সময়ে তাদের মনে গেঁথে দেবার উপযুক্ত সময়। শিশুদের পর্যবেক্ষণ শক্তি, শেখার ইচ্ছা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং পরিশেষে অপরের মধ্যে সেই জ্ঞানের বিস্তারের জন্য সহজাত প্রবৃত্তি থাকে এবং অতি সহজে তা পরিবর্তন আনতে সক্ষম। শিশুর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতা থাকলে বিদ্যালয়ে শেখা বিষয়গুলি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারে। ভারতবর্ষে মোট জনসংখ্যার ৪২ শতাংশ হল ১৬ বছরের নিচের শিশুরা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ব্যাপক শিক্ষাপ্রসারের কর্মসূচী গৃহীত হওয়ার দরুন প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিদ্যালয় গড়ে উঠছে। বর্তমানে প্রায় ৯০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। ফলে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ৪২,৬৫৯ (১৯৭৮), তা আজ দাঁড়িয়েছে ৪৮,৪৫৬ (১৯৮৬) এ। প্রাথমিক স্তরে স্কুলে ভর্তির (পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত) সংখ্যা প্রায় ৭৮ শতাংশ এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তির সংখ্যা প্রায় ৪১ শতাংশ। স্কুলের খাতায় নাম নেই যাদের তারা বেশির ভাগই বালিকা—যারা ছোটো ছোটো ভাইবোনদের দেখাশোনার জন্য বাড়িতে আটকে থাকে। পড়াশোনার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিতান্তই পারিবারিক কারণে তারা লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বিদ্যালয়গামী এই অসংখ্য ছাত্রছাত্রী আমাদের এক বিরাট সম্পদ যাদের কোনোক্রমেই স্বাস্থ্যকর্মসূচীর আওতার বাইরে রাখা চলে না। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচী কাজে লাগানো অত্যন্ত জরুরী। তাই একটি আদর্শ ও সুসংহত বিদ্যালয়-স্বাস্থ্যপ্রকল্প প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরী।

প্রকল্পটি স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা এবং সম্পদের সরবরাহের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা উচিত। কারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যেন এ থেকে সর্বাপেক্ষা বেশি উপকৃত হয়। শিশুর সামগ্রিক বিকাশের দায়িত্ব যেমন জনগণের তেমন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও বটে। তাই বিদ্যালয় স্বাস্থ্য সেবা জাতীয় স্বাস্থ্যপ্রকল্পের একটি বিশেষ কাজ এবং এটি অন্য কাজের থেকে আলাদা নয়। সমগ্র দেশের স্বাস্থ্যপ্রকল্পের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

একজন বিদ্যালয়গামী শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ ও বুদ্ধি একটি পদ্ধতির মধ্যে হয়। ঘরের সুরক্ষিত পরিবেশ ছেড়ে শিশুর প্রথম বাইরের জীবনের অভিজ্ঞতা হয় বিদ্যালয়ের মাধ্যমে। আর এই জীবনে সে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক পরিবেশ, এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন শিশুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে নানা রকম চাপ অথবা পীড়নের মুখোমুখি হয়। শিশুরা ক্রমাগত শারীরিক, মানসিক অনুভূতি এবং সামাজিক দিক থেকে পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাতায়াত কালেই (৬-১৪ বছর) এই ধরনের কম বেশি পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্তু পরে বয়ঃসন্ধিক্ষণে তা যেন আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং নানা রকমের জটিলতার সৃষ্টি করে। এই সমস্ত চাপ বা পীড়ন মূলত প্রতিযোগিতার কারণে দেখা দেয়। প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া শিশুদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তাই বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশ থেকে আসা এই দলগত জীবনের একটি অসঙ্গতির দিকও আছে। যেমন শৈশবে শারীরিক গঠন সম্পূর্ণ হয় না বলে তারা ছোটোবেলাতেই অনায়াসে বিভিন্ন রোগের শিকার হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ে একসঙ্গে থাকার ফলে অনেক সময়ই তাদের ছোঁয়াচে

রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আরেকটি দুর্ঘটনা হল, বিকলাঙ্গতায় আক্রান্ত হওয়া। শৈশবের রোগগুলি অর্থাৎ পোলিও, ডিপথেরিয়া, বসন্ত, যক্ষ্মা সবগুলোই মৃত্যু ও বিকলাঙ্গতার কারণ। সুতরাং রোগ এবং শিশু উভয়ের ক্ষেত্রেই এটি নিবারণ করা প্রয়োজন। তা না হলে অক্ষমতা বা অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে, অন্যান্য শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা বেরিয়ে আসে ফলে পড়াশোনা এবং সামাজিক জীবন নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে শীঘ্রই সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরী।

শিক্ষালাভ করার জন্য শিশুদের অবশ্যই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। দেখা, শোনা বা অন্যান্য কোন ক্ষেত্রে অক্ষমতা থাকলে শেখার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হতে পারে অথবা ব্যক্তিত্ব এবং ব্যবহারে পরিবর্তন আসতে পারে। সুতরাং শিশুরা যাতে স্বাভাবিক উপায়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে, তার জন্য এগুলি শুধরে দেওয়া উচিত। নয়তো প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ স্কুলের সংখ্যা বাড়বে বৈ কমবে না।

একটি শিশু একজন বয়স্ক মানুষের তুলনায় সহজে এবং তাড়াতাড়ি শিখতে পারে। বিদ্যালয় জীবনে তাদের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে বেঁচে থাকার কিছু ভালো অভ্যাস গড়ে তোলা যায়। তারা আবার এটা, যারা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না, তাদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারে। সুতরাং এই গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট না করে একে অবশ্যই প্রাথমিক স্বাস্থ্যপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। সামান্য কিছু প্রশিক্ষণ দিয়ে আমরা তাদের হেলথ্ গাইড, হেলথ প্রোমোটার এবং গ্রামের মানুষের কাছে পরিবর্তিত প্রতিনিধিরূপে ব্যবহার করতে পারি।

আমাদের দেশে বিদ্যালয়গুলিতে স্বাস্থ্যশিক্ষা বিক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হয়ে থাকে। আবার এও দেখা যায় যে, অনেক বিদ্যালয়ে এধরনের শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নেই। যার ফলে উপদেশের আকারে দেওয়া এই পদ্ধতি বহুলাংশে শিশুর প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার সংগে পারস্পরিক সম্বন্ধ খুব একটা থাকে না। ফলতঃ স্বাস্থ্যশিক্ষা সেক্ষেত্রে নেহাতই বই নির্ভর হয়ে পড়ে এবং নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে শিশুদের আগ্রহ বা উৎসাহ বিশেষ দেখা যায় না।

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে যে স্বাস্থ্যশিক্ষাকে 'শিশুর মাধ্যমে যদি শিশুর' কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তবে সে পদ্ধতি ফলদায়ক ও সঠিক উপায়ে হয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কার্যভিত্তিক শিক্ষাকে জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে কারণ এযাবৎ শিশু তার জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের কাছ থেকে তৈরি করা স্বাস্থ্যবার্তা পেয়ে এসেছে যা মোটেই কার্যকরী হয়নি। এজন্য শিশুর মাধ্যমে শিশুর কাছে পৌঁছে দেওয়ার এই পদ্ধতি দৈনন্দিন স্বাস্থ্যচর্চার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে যথেষ্ট সক্ষম।

সমগ্র পৃথিবীব্যাপী পর্যবেক্ষণের ফলে, বিশেষতঃ অনুন্নত ও উন্নতিশীল দেশগুলিতে শিশু থেকে শিশুশিক্ষার উদ্ভূত পদ্ধতি থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে বয়স্ক শিশুরা অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ছোট ছোট শিশুদের যত্ন নিতে যদি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে তবে সে পদ্ধতি বহুক্ষেত্রেই কার্যকরী হয় এবং আশানুরূপ ফলও পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় বিদ্যালয়গামী শিশুরা প্রতিবেশী, জনসাধারণ অথবা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেও স্বাস্থ্যাভ্যাস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দিয়ে, নিয়মিত স্বাস্থ্যশিক্ষার আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের উপযুক্ত স্বাস্থ্যশিক্ষক রূপে পারদর্শী করে তোলা প্রয়োজন যাতে সমাজে বা জনসাধারণের মধ্যে একজন দক্ষ পরিবর্তনকারীর ভূমিকা পালন করতে পারে।

এই পদ্ধতির সংগে সঙ্গতি রেখে বয়স্ক শিশুদের জন্য যে কার্যক্রম তৈরি হবে তা যেন সফল ও সহজভাবে প্রয়োগ করা যায় তা দেখতে হবে। কার্যক্রম হবে প্রয়োজনভিত্তিক অর্থাৎ জনসাধারণের অনুভূত চাহিদা অনুযায়ী এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে সব সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন হবে তা যেন সহজলভ্য হয়। বিদ্যালয়গামী শিশুদের স্বাস্থ্যশিক্ষার বিষয়টিকে জোরদার করার বিশেষ উদ্দেশ্য হল শিশুদের, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়ের শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মান উন্নয়ন করা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে স্বাস্থ্যশিক্ষার যে ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাকে সফলরূপে বাস্তবায়িত করতে গেলে শিশু থেকে শিশুশিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

আমিনুল আহসান
বিদ্যালয় স্বাস্থ্যবিভাগ
ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভলান্টারী হেলথ এসোসিয়েশন

বিদ্যালয়-স্বাস্থ্যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের ভূমিকা

বিদ্যালয়-স্বাস্থ্য সম্পর্কে WBVHA এর উদ্দেশ্য হল ঃ

* নতুন প্রথায়, প্রয়োজনভিত্তিক, প্রাসঙ্গিক বিদ্যালয়-স্বাস্থ্য প্রকল্প আরম্ভ।
* আঞ্চলিক স্তরে প্রকৃত পরিকল্পনা, বাস্তব রুপায়ণ এবং মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।
* স্বাস্থ্যপ্রকল্পে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে তা প্রসারিত করা।
* প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ তৈরি ও তা প্রসারিত করে বিদ্যালয়-স্বাস্থ্যপ্রকল্পকে গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প শিক্ষাপদ্ধতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করা।

কেমন করে আরও সুন্দর ও সুস্থজীবন যাপন করা যায়, তা বিদ্যালয়-স্বাস্থ্যপ্রকল্পের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমেই ছাত্র-ছাত্রীদের মনে গেঁথে দেওয়া যায়। যদি শেখার বিষয় পরিষ্কার এবং নির্দিষ্ট হয় তাহলে শিশুরা যে তা সহজে গ্রহণ করতে পারবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিদ্যালয়-স্বাস্থ্যপ্রকল্পে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিশুদের প্রয়োজনীয় অংশগ্রহণের স্বীকৃতি গত কয়েক বছরে ভারতে স্বাস্থ্য-পরিকল্পনাকারীদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। বিদ্যালয়-স্বাস্থ্যপ্রকল্পে বিদ্যালয়গামী ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক/শিক্ষিকাদের বিশেষ ভূমিকা, তাদের জীবনযাত্রা ও সুস্থভাবে বেঁচে থাকার পদ্ধতিকে যথেষ্ট উন্নত করে তুলতে পারে।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি আচরণের একটা আদর্শ গড়ে তুলতে হবে যাতে নিজের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সহায়ক হয় এবং ছাত্রদের সামনেও একটা উদাহরণ স্থাপন করা যায়। বাঞ্ছিত পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে দিয়ে একটা স্বেচ্ছাসেবী ভাবাবেগময় বাতাবরণ রক্ষার জন্য সচেতনতা ও কর্মকুশলতা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই শিক্ষক- শিক্ষিকাদের সঙ্গে ছাত্র -ছাত্রীদের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর এই কারণেই বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যপ্রকল্পে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের বিশাল সংখ্যায় পাওয়া যায়। তাঁরাই সবচেয়ে ভালোভাবে স্বাস্থ্য-শিক্ষা দেওয়ার ভার গ্রহণ করতে পারেন। তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ক্ষমতা এই কাজের পক্ষে উপযুক্ত। তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের, তাদের অভিভাবকদের এবং সমগ্র জাতিকে সচেতন করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারেন। বেশিরভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকাই স্থানীয় রীতিনীতি, ধর্মীয় আচার আচরণ এবং সংস্কার সম্বন্ধে অবগত থাকেন। ফলে তারা সহজেই ছাত্র-ছাত্রীদের বদ অভ্যাস বা কুসংস্কার সমন্ধে সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে দায়িত্বপর্ণূ ভুমিকা পালন করতে পারেন।

সমাজে বা মানুষের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটি বিশেষ শ্রদ্ধার স্থান আছে। আর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সরকার এবং সমাজের কাছ থেকে তাঁরা এ বিষয়ে আরও ভালো সাহায্য পেতে পারেন।

স্বাস্থ্যপ্রকল্পে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অংশগ্রহণ সমগ্র জাতিকে উন্নত করার পক্ষে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একজন ভালো শিক্ষক-শিক্ষিকা বাইরের যে কোনো স্বাস্থ্যকর্মীর তুলনায় ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক, সামাজিক এবং আবেগগত চাহিদা ভালোভাবে বুঝতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা/ইউনেস্কোর বিশেষজ্ঞ সমিতির মতে স্বাস্থ্যশিক্ষার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রস্তুতির ব্যাপারে প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল ঃ

- ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি আচরণের একটা আদর্শ গড়ে তুলতে হবে যাতে নিজের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে এবং ছাত্রদের সামনেও একটা উদাহরণ স্থাপন করা যাবে।
- বাঞ্ছিত পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে দিয়ে একটা স্বেচ্ছাসেবী ভাবাবেগময় বাতাবরণ রক্ষার জন্য সচেতন কর্মকুশলতা গড়ে তুলতে হবে।
- সমগ্র শিক্ষাসূচীর অংশ হিসাবে স্বাস্থ্যশিক্ষার স্থান, প্রয়োজনীয়তা ও সামগ্রিক মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।
- বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতির বিষয়ে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণের জন্য আন্তরিক ইচ্ছার দরকার।
- বিদ্যালয়-স্বাস্থ্য, শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি, বিকাশ এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য ও কর্মসূচী রূপায়ণ করতে হলে পেশাগত জ্ঞানের যথেষ্ট পটভূমিকার প্রয়োজন। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও তার রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে জ্ঞানও প্রয়োজন।
- স্বাস্থ্যশিক্ষার উন্নতি বিধানে কর্মকুশলতা এবং এই বিষয়ে অপরের সঙ্গে সহযোগিতার আদান-প্রদান বাঞ্ছনীয়।
- জনস্বাস্থ্য ও সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে এবং কেমন করে শিক্ষক/শিক্ষিকা তাঁদের সঙ্গে ভালোভাবে কাজ করতে পারেন সেই উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।
- সমাজের প্রত্যাশা মেটাতে স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রস্তুতি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সহায়তা করে — স্বাস্থ্য বিষয়ে নবীনদের প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গী, অভ্যাস ও জ্ঞানবিকাশে শিক্ষক-শিক্ষিকা সাহায্য করতে পারেন।
- প্রশিক্ষণ শিক্ষককে তাঁর নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে সচেতন করে এবং সেইগুলি লাভ করতে সাহায্য করে। তাই শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা জরুরী। এর দ্বারা শিক্ষক-শিক্ষিকা শিশুমনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে থাকেন।
- এতে শিক্ষক-শিক্ষিকা বিদ্যালয়ের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আরও সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারেন এবং জনগণকে অনেক কিছু দিতে পারেন।
- শিক্ষক-শিক্ষকা শিশুদের স্বাস্থ্য-সমস্যাগুলি জানতে পারেন এবং তাদের বাড়ির সঙ্গে আরও ভালোভাবে সহযোগিতা করতে পারেন। অধিকিন্তু শিক্ষক বুঝতে পারেন যে যদিও স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান স্বাস্থ্যবিধি আচরণে প্রকৃষ্ট পরিবর্তন আনে তবু কেবলমাত্র জ্ঞান বিতরণই যথেষ্ট নয়।
- আচরণ-জ্ঞান, অলীক দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভাবনা-চিন্তার চেয়ে কাজ করার গুরুত্ব অনেক বেশি। আর সেই কারণেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার পদক্ষেপ হওয়া উচিত 'আচরণ নিয়ন্ত্রিত' —'জ্ঞান নিয়ন্ত্রিত নয়'।

বিদ্যালয়-স্বাস্থ্য প্রকল্পের পরিকল্পনা পদ্ধতি

১। বিদ্যালয়ে সংগৃহীত স্বাস্থ্য সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করা।

২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা।

৩। এই উদ্দেশ্য রূপায়ণে বাস্তব কর্মসূচী তৈরি করা।

৪। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করা।

৫। প্রকল্পের দক্ষ পরিচালনার ব্যবস্থা করা।

৬। পুনরায় স্বাস্থ্যতথ্য সংগ্রহ করে ফলাফল মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।

উদ্দেশ্য

শিশু থেকে শিশুশিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা বিদ্যালয়গামী ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মানোন্নয়ন করা।

বড় ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যশিক্ষায় দক্ষ করে তোলা, যাতে তারা অপেক্ষাকৃত ছোট শিশুদের, পাড়াপ্রতিবেশী ও নিজ নিজ পরিবারে এবং সর্বোপরি নিজ নিজ অঞ্চলে উপযুক্ত স্বাস্থ্যশিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে পারে।

এছাড়াও কতকগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে যেমন—

১। বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার বিষয়টিকে আরও জোরদার করা যাতে প্রাথমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে আত্মসচেতনতা গড়ে ওঠে ও ব্যবহারিক জীবনে তা যথাযথভাবে পালন করতে পারে।

২। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণপদ্ধতি ও কলাকৌশলের আয়োজনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যশিক্ষাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা এবং শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব দেওয়া।

৩। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে, ভাইবোনদের মধ্যে এবং বাড়িতে বাবা-মায়ের কাছে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নানা খবরাখবর পৌঁছে দেবার সক্রিয় মাধ্যম হিসাবে কাজে লাগান।

৪। স্বাস্থ্যসক্রান্ত নানা তথ্য বিদ্যালয়ের বাইরে পৌঁছে দেবার জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন বৃদ্ধি করা।

কর্মপদ্ধতি

শিশু থেকে শিশুর মাধ্যমে স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচীর প্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্যালয় স্বাস্থ্যশিক্ষা পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের জন্য একটি সংগঠিত ও ধারাবাহিক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রত্যক্ষ অন্তর্ভুক্তিকরণ ও অংশগ্রহণ এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য। শিশুদের মাধ্যমে শিশুশিক্ষাদানের ব্যবহারিক প্রয়োগের বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষকাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আমাদের বিদ্যালয়-স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে দেওয়া হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রথমে বুঝে নিতে হবে যে প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের কি কি করতে হবে।

(১) বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কী ধরনের স্বাস্থ্যপরিষেবা প্রয়োজন সেটা বোঝার জন্য তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে নজর রাখতে হবে। অর্থাৎ প্রধান স্বাস্থ্যসমস্যা কী তা খুঁজে বের করতে হবে।

(২) ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণক্ষমতা ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তাছাড়া তাদের ওজন ও উচ্চতা মেপে দেখতে হবে যে তারা ঠিকমত বেড়ে উঠছে কিনা।

(৩) বড় ছেলেমেয়েদের (বিশেষত চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের) স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নানা দিক, পরিচ্ছন্নতা এবং পুষ্টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে।

(৪) দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছে কিনা সেদিকে নজর দিতে হবে।

(৫) বড় ছেলেমেয়েরা অপেক্ষাকৃত ছোট-ছেলেমেয়ে, ভাইবোন এবং বাড়িতে বাবা, মা ও পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত নানা তথ্য পৌঁছে দিচ্ছে কিনা দেখতে হবে। শিশু থেকে শিশুদের স্বাস্থ্যশিক্ষা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। ছোট ছেলেমেয়েরা নিজেদের সহপাঠী, বন্ধুবান্ধব, পরিবার, প্রতিবেশী এবং অঞ্চলের নির্দিষ্ট কিছু মায়েদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে নিজেদের আঞ্চলিক পরিবেশের নির্দিষ্ট কিছু পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

শিক্ষক/শিক্ষিকাদের ভূমিকা

১। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ত্রুটি- বিচ্যুতি কী আছে সেদিকে নজর রাখতে হবে। দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণক্ষমতা, উচ্চতা, ওজন ও ছাতির মাপ পরীক্ষা করেও মেপে দেখতে হবে। উল্লেখযোগ্য ত্রুটি দেখা দিলে সেই অনুসারে বাবা-মাকেও এ ব্যাপারে অবহিত করতে হবে।

২। লক্ষ্য রাখতে হবে কোন ছেলেমেয়েদের কোন সংক্রামক রোগের লক্ষণ আছে কিনা সেই অনুসারে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে যাবার নির্দেশ দিতে হবে।

৩। বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নানা ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে বড় ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যপরিচ্ছন্নতা ও পুষ্টিশিক্ষা দিতে হবে।

৪। বড় ছেলেমেয়েরা স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নানা তথ্য ছোট ভাইবোন, সহপাঠী, বাড়িতে বাবা-মা এবং অঞ্চলের সবার কাছে কীভাবে পরিবেশন করবে সে ব্যাপারে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করবে। শিক্ষক-শিক্ষিকারাই বলে দেবেন যে কোন পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের বাইরে সকলের কাছে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নানা বিধি ও তথ্য পরিবেশিত হবে।

৫। নিয়মিতভাবে ছোট ছেলেমেয়েদের নানা কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান করতে হবে এবং সেই অনুসারে তাদের নিয়ন্ত্রিত করতেহবে।

৬। কর্মসূচীর সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য বাবা-মাদের একত্রিত করে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করতে হবে। অর্থাৎ দেখতে হবে যে তাঁরাও যেন এতে অংশগ্রহণ করেন।

৭। প্রথমে বিদ্যালয়ের ও পরে আঞ্চলিক পরিবেশের উন্নতিকল্পে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত প্রচার অভিযানও চালাতে হবে এবং অনুরূপ স্বাস্থ্যপ্রকল্প গড়ে তুলতে হবে।

৮। সাধারণ অর্থাৎ ছোটখাটো ক্ষত নিরাময়ের ও কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে হঠাৎ কোন প্রয়োজন হলে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং এ ব্যাপারে শিক্ষিত/শিক্ষিকাদের প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে দক্ষতা থাকা প্রয়োজনীয়।

৯। স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রতিষেধকের ব্যাপারে সহায়তা করতে হবে।

১০। ছেলেমেয়েদের কার স্বাস্থ্য কেমন তার একটা রেকর্ড রাখতে হবে।

এই প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করবে শিক্ষক -শিক্ষিকারা তাদের ভূমিকা পালনে কতদূর সক্ষম তার উপর। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উৎসাহ উদ্দীপনা যত বেশি হবে এবং তারা যত সক্রিয় হবেন আমাদের উদ্দেশ্যও তত বেশি সফল হবে।

ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত তালিকা

শিক্ষক-শিক্ষিকারা কীভাবে কি করবেন সে বিষয়ে একটি কর্মতালিকা তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে এটি একটি নির্দেশিকার কাজ করবে। গ্রামীণ বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সমস্যাগুলির অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এতে রয়েছে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নানা তথ্য ও প্রণালী এবং বড় ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা এবং পুষ্টিসংক্রান্ত তথ্য পরিবেশনের সঠিক পদ্ধতি।

কর্মতালিকা ব্যবহার বিধি

এই কর্মতালিকা কেবলমাত্র শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ব্যবহারের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, এই কর্মতালিকার মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষিকিরা তাদের কর্মসূচি ঈঙ্গিত পথে রূপায়িত করতে পারবেন এবং তালিকা কখনই ছেলেমেয়েদের পাঠ করে শোনাবেন না।

যে ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি কর্মতালিকা তৈরি করা হয়েছে তা শুরুতেই উল্লিখিত হয়েছে। এর পরবর্তী পর্যায় হল বিষয়বস্তুর আলোচনা। ছেলেমেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কী উপায়ে বললে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে এবং ছেলেমেয়েরাও উৎসাহিত হবে তাও বলা আছে। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করে দেখান এবং ছাত্রদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

গল্প, নাটক, নৃত্য, অভিনয়, খেলাধূলা প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তাদের কাছে বিষয়গুলি পৌঁছে দেবার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এমন কিছু করতে হবে যার জন্য বিশেষ কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। শিক্ষক-শিক্ষিকারা গল্পের মাধ্যমেও বিষয়ের অবতারণা করতে পারেন। গল্পের মাধ্যমে কোন বিষয়বস্তু পরিবেশিত হলে সেটা আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, তাছাড়া গল্প শিশুদের কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটায়।

কর্মকুশলতার তালিকায় এমন সব ক্রিয়াকলাপের কথা বলা হয়েছে যার মাধ্যমে বড় ছেলেমেয়েরা নিজ নিজ অঞ্চলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা তথ্য পৌঁছে দিতে পারে।

'শিশু থেকে শিশুর স্বাস্থ্যশিক্ষার' কর্মতালিকা

বিদ্যালয়-স্বাস্থ্যপ্রকল্পকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য শিশুর বেঁচে থাকা এবং শিশুর সার্বিক অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সংক্রান্ত সাতটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এই কর্মতালিকা তৈরি করা হয়েছে। বিষয়গুলি হল ঃ—

১। ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা
২। খাদ্য ও পুষ্টি
৩। ডায়রিয়া রোগ প্রতিরোধ
৪। ম্যালেরিয়া নিবারন
৫। কৃমিসংক্রমণ ও প্রতিরোধ
৬। পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা
৭। প্রতিষেধক

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারাই শিশুদের পরিচালনা করবেন। বিদ্যালয়ে এবং সমাজে এই কার্যধারা পুরোপুরি তাদের নেতৃত্বেই চলবে।

পরবর্তীকালে মাঝে মাঝে অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করতে হবে। এজন্য কর্মধারায় পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন। শিশুরা যাতে স্বাস্থ্য-পুষ্টি ইত্যাদির মূল বিষয়গুলি ভুলে না যায় সেজন্য নিয়মিত প্রতিটি বিষয়ের উপর প্রশ্ন করতে হবে। শিক্ষিকা-শিক্ষিকা দেখবেন কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে এবং দৈনন্দিন জীবনে উক্ত স্বাস্থ্যশিক্ষা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবেন।

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা

সুস্থভাবে বাঁচতে গেলে ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। ছোটবেলা থেকেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার এই অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং এই অভ্যাসগুলোকে দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ করে নিতে হবে।

বিষয়

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বলতে বোঝায় ব্যক্তিগত অভ্যাসগুলোর উন্নতিসাধন। আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ, যথা— ত্বক, চুল, দাঁত, নখ, চোখ, কান এবং পা যাতে সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে সে ব্যাপারে সজাগ থাকা প্রয়োজন। কারণ বেশির ভাগ রোগের মূলে রয়েছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব এবং নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায়।

চামড়া বা ত্বক

প্রথমেই বলি চামড়ার কথা। চামড়া হল দেহের ওপর আবরণ সৃষ্টিকারী এক টিসু। এর দুটি স্তর আছে—অপি চর্ম ও প্রকৃত চর্ম। অপি চর্ম আবরণ দিয়ে প্রকৃত চর্মকে ঢেকে রাখে। চামড়ার আবরণ থাকার ফলেই জীবাণু বা কোন ক্ষতিকর পদার্থ সরাসরি আমাদের দেহের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না।



সারাদিন আমাদের দেহে প্রচুর ধূলো, ময়লা এবং ঘাম জমে, আর এই আবর্জনাগুলো চামড়ার উপরিভাগেই থাকে, যদি নিয়মিত স্নানের মাধ্যমে এগুলো পরিষ্কার করা না হয় তবে চামড়ার ওপর জীবাণু বাসা বাঁধে। যার ফলে পরে নানা ধরনের চর্মরোগ, যেমন—খোস, পাঁচড়া, দাদ, উকুন প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। এই রোগগুলি যেমন যন্ত্রণাদায়ক তেমন ছোঁয়াচে। তাই এইসব রোগ যাতে না হয় সে ব্যাপারে যথেষ্ট সর্তক হওয়া প্রয়োজন, তার জন্য দরকার নিয়মিত স্নানের সময় প্রতিদিন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাবান ও জল দিয়ে ভাল করে পরিষ্কার করা যাতে ধূলো, বালি অথবা ঘাম জমে না থাকে। সাবানের পরিবর্তে ব্যাসনও ব্যবহার করা যেতে পারে। চামড়ায় জীবাণু আক্রমণে ফোঁড়া হয়, ভাইরাস আক্রমণে হার্পিস হয়। ছত্রাক আক্রমণে দাদ হয়, পরজীবী আক্রমণে খোস হয়। তাই ত্বকের পরিচ্ছন্নতা বিশেষ জরুরী।

চুল

চুল শধু মস্তিষ্ককে রক্ষাই করে না, সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করে। কিন্তু চুল ঠিকমত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না রাখলে ময়লা জমে উকুন, খুসকির উপদ্রব শুরু হয়। চিরুনি দিয়ে চুল প্রতিদিন ভালো করে আচড়ান দরকার। যাদের খুব লম্বা চুল তাদের খুব ভালো করে চুল আঁচড়ে ফিতে দিয়ে বেঁধে রাখা উচিত।



নখ

লম্বা নখে ময়লা জমে বেশি, এবং তাতে বিভিন্ন ধরনের রোগজীবাণু, বিশেষত কৃমির ডিম আটকে থাকে। যাদের লম্বা নখ আছে তারা যখন কোন খাবার খায় অথবা কোন খাবার নাড়াচড়া করে তখন নখের মধ্যে আটকে থাকা জীবাণু খাবারের সাথে পেটে চলে যায় এবং রোগ সৃষ্টি করে। তাই এই সব অবাঞ্ছিত রোগ যাতে না হয় তার জন্য নখ ছোট করে কেটে



রাখতে হবে এবং তা পরিষ্কার রাখতে হবে। তাই খেলাধুলো এবং খাবার খাওয়ার আগে ভাল করে হাত ধোয়া অত্যন্ত জরুরী।

দাঁত

আমাদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে দাঁতের গুরুত্বও অপরিসীম। দাঁত আমাদের খাবার চিবিয়ে খেতে সাহায্য করে। আর খাবার ঠিকমত চিবিয়ে না খেলে খাবার হজম হয় না। তাই শরীরের পুষ্টির জন্য দাঁতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
যদি নিয়মিত দাঁত ভালোভাবে পরিষ্কার করা না হয় তবে দাঁতের ফাঁকে খাবারের কণা জমে ব্যথা হয়। মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং পরে দাঁতে গর্ত হয় এবং দাঁত পড়ে যায়। তাই রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে দাঁত মাজা উচিত। এছাড়া রাত্রিবেলা



শোবার আগেও দাঁত মাজা ভাল, টুথব্রাশ বা বাবলা, নিম ইত্যাদি গাছের নরম ডালও দাঁতন রূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। দাঁত মাজার জন্য বাজারের যে কোন মাজন অথবা নুন তেল দিয়ে তৈরি মাজনও ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রত্যেকবার খাবার খাওয়ার পর মুখ ধুয়ে ফেলা উচিত। যাতে দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো বেরিয়ে আসে। এতে দাঁত মজবুত হয় এবং দাঁতের আয়ুও বাড়ে। দাঁত ভাল রাখার জন্য খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া বাঞ্ছনীয়। অতিরিক্ত পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট ও শর্করাযুক্ত খাবার না খাওয়াই ভাল।

চোখ

চোখ দেহের একটি অত্যন্ত মূল্যবান অঙ্গ, তাই চোখকে যে কোন প্রকার আঘাত বা সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা উচিত, সকালে, রাত্রে এবং খেলাধুলোর পরে পরিষ্কার জলে চোখ ভালো করে ধুয়ে ফেলা উচিত। কোন ধুলিকণা চোখে ঢুকলে চোখ না রগড়িয়ে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলতে হয়। চোখের ওপরের পাতায় কোন ধূলিকণা ঢুকলে চোখের পাতা উল্টে পরিষ্কার রুমালের কোণা দিয়ে আস্তে করে কণাটা বের করে আনতে হয়। মুখে বা চোখের



পাতায় যাতে মাছি বা পোকামাকড় না বসে বা না কামড়ায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে কারণ তাতে চোখ সংক্রমিত হবার আশঙ্কা থাকে। এছাড়া অন্যের রুমাল বা তোয়ালে অথবা সুর্মা-কাজল ইত্যাদি চোখে লাগান উচিত নয়। সূক্ষ্ম হাতের কাজ বা লেখাপড়ার কাজ পর্যাপ্ত আলোয় করা উচিত। আবার চোখ ঝলসানো আলোও চোখের পক্ষে ক্ষতিকর অর্থাৎ এমন আলোয় কাজ করতে হবে যাতে চোখে কোন চাপ না পড়ে। গাজর, পেঁপে সবুজ শাকসব্জি প্রভৃতি ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাদ্য চোখের পক্ষে উপকারী।

নাক, কান ও গলা

আঙুল, দেশলাই কাঠি বা চুলের পিন দিয়ে কান খোঁচানোর দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়, যা অনেক সময় অনেক বড় রকমের দুর্ঘটনার

কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কান খোঁচানোর ফলে অসাবধানতাবশতঃ কানের পর্দায় আঘাত লাগতে পারে তাছাড়া কানের ভেতরে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে ও পুঁজ দেখা দিতে পারে। এতে কানে সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে। এইরূপ অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনা এড়াতে কানের ভিতর কোন রকম কাঠি জাতীয় জিনিস দিয়ে খোঁচানো ঠিক নয়। এছাড়া নাক খোঁচানো উচিত নয়। যে কোন সময় রক্তপাত ঘটতে পারে। যেখানে সেখানে নাক ঝাড়া, থুথু ফেলাও দৃষ্টিকটু এবং অস্বাস্থ্যকর। এতে যক্ষ্মার মত সংক্রামক ব্যাধি ছড়ায়। তাই নাক, কান, গলার যত্ন নেওয়া ও পরিষ্কার রাখা ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

পেট পরিষ্কার রাখা

নিয়মিত মলত্যাগের মাধ্যমে পেট পরিষ্কার রাখার অভ্যেস গড়ে তোলা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন প্রাতঃকালে মলত্যাগ করলে শরীর ভালো থাকে এবং তার ফলে সারাদিনের সমস্ত কাজ ভালোভাবে স্বচ্ছন্দে করা যায়।

পোশাক ও জুতো ব্যবহারের অভ্যাস

প্রত্যেকের স্নানের পর পরিষ্কার জামাকাপড় পরা উচিত। নেংরা জামাকাপড় থেকে দুর্গন্ধ বের হয়, ছারপোকা, উকুন, মাছি প্রভৃতি এসে নোংরা জামাকাপড়ে বসে। তাছাড়া ঘামে ভেজা জামাকাপড় থেকে অনেক সময় চর্ম রোগ হয় এবং জীবাণুর সংক্রমণও হয়। জুতো আমাদের পা-কে সাপের কামড়, কৃমিসংক্রমণ এবং যে কোন আঘাত থেকে রক্ষা করে। এজন্য জুতো পরা অত্যন্ত নিরাপদ।

দেহকে রোগমুক্ত রাখার জন্য ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার বিভিন্ন দিকগুলো অর্থাৎ নিয়মিত যা অভ্যাস করা উচিত সেগুলো সংক্ষেপে নিচে দেওয়া হল ঃ—

১। **প্রতিদিন সকালে নিয়মিতভাবে মলত্যাগ।**

২। **মলত্যাগ ও খেলাধুলোর পর ভালোভাবে সাবান দিয়ে হাত, পা ও মুখ ধোয়া।**

৩। **সকালে ও রাত্রিবেলা দাঁত মাজা।**

৪। **প্রত্যহ খেলাধুলোর পর ও রাতে বিছানায় যাবার আগে এবং সকালে পরিষ্কার জলে চোখ ধোয়া।**

৫। **প্রত্যহ স্নান করা, পরিষ্কার জামাকাপড় পরা।**

৬। **হাত ও পায়ের নখ ছোট করে কাটা ও পরিষ্কার রাখা।**

৭। **বাড়ির বাইরে খালিপায়ে যাওয়া উচিত নয়।**

৮। **প্রতিদিন স্নানের পর চুল আঁচড়ানো।**

৯। **নাক ও কানের ভেতর আঙুল, দেশলাইকাঠি বা চুলের পিন দিয়ে না খোঁচানো।**

১০। **যেখানে সেখানে নাকঝাড়া বা থুতু না ফেলা।**

শিক্ষক-শিক্ষিকা কীভাবে স্বাস্থ্য-শিক্ষার এই বিষয়গুলো ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন

১। শ্রেণীকক্ষে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নানা আলাপ-আলোচনা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

২। উদাহরণ দিয়ে অথবা ছোট ছোট গল্পের আকারে স্বাস্থ্যশিক্ষার বিষয়গুলো সহজ করে বোঝানোর মাধ্যমে।

৩। ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা তদারকির মাধ্যমে। যদি তাদের নখ লম্বা এবং তাতে ময়লা থাকে তবে ক্লাসরুমেই তা ছোট করে কেটে নিতে বলা উচিত।

৪। ক্লাসরুমে স্বাস্থ্যবিষয়ক ছোট ছোট কবিতা, ছড়া, নাটক বা স্লোগানের আয়োজন করে।

৫। এই সমস্ত বিষয়ের উপর রঙিন পোস্টার, চার্ট, ব্যানার, স্লোগান ছেলেমেয়েদের দিয়ে তৈরি করিয়ে ক্লাসরুমে টাঙিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এতে ছেলেমেয়েদের উৎসাহ বাড়ে ও শেখার আগ্রহ জন্মায়।

শিশুদের করণীয় বিষয়গুলি

১। প্রতিটি ক্লাসের ছেলেমেয়েরাই নিজের ক্লাসের জন্য একটি প্রাত্যহিক পরিচ্ছন্নতার উপর তালিকা প্রস্তুত



করে ক্লাসরুমে টাঙিয়ে রাখবে যাতে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই তাদের অভ্যাসগুলো পালন করছে কিনা তা লিখে রাখতে পারে।

২। বড় ছেলেমেয়েরা যারা উঁচু ক্লাসে পড়ে তারা অপেক্ষাকৃত ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতি নজর রাখবে। ছোট শিশুরা ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসগুলি পালন



করছে কিনা অথবা না করলে যাতে তারা নিয়মিত পালন করে তার তদারকি করবে। এজন্য 'তারা' একটি রেকর্ড রাখার খাতা তৈরি করবে যেখানে নাকি ছোট ছেলেমেয়েদের পরিচ্ছন্নতার অভ্যেস গড়ে উঠছে কিনা তার একটা রেকর্ড রাখবে এবং সেই অনুসারে ছোট ছেলেমেয়েদের পরিচ্ছন্নতার অভ্যেস গড়ে তোলার ব্যাপারে পরিচালিত করবে।

৩। ছেলেমেয়েরা বাড়িতে গিয়ে ভাইবোনদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার তদারকি করতে পারে।

৪। পথনাটিকা বা সঠিক স্লোগান নির্বাচনের মাধ্যমে শিশুরা অঞ্চলের সকলের কাছে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নানা তথ্য পৌঁছে দেবে।

মূল্যায়ন ঃ

- শিক্ষক-শিক্ষিকারা নানা প্রশ্ন করলেই বুঝতে পারবেন যে তাদের স্বাস্থ্যসম্পর্কে এবং পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে কোন সঠিক ধারণা বা জ্ঞান হয়েছে কিনা।
- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার বিভিন্ন দিক অর্থাৎ হাত, পা, চুল, চোখ, নখ, দাঁত ইত্যাদি পরীক্ষার মাধ্যমে।
- প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে শিশুদের পরিচ্ছন্নতার তালিকা পরীক্ষার দ্বারা।
- অভিভাবক ও শিক্ষকমন্ডলীর যৌথ আলোচনা সভায় অথবা কোন উপলক্ষে একত্র সমাবেশকালে অথবা প্রীতিসম্মেলনে শিক্ষক-শিক্ষিকা ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যচর্চা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন অর্থাৎ বাড়িতে ছেলেমেয়েরা স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিনিষেধগুলো ঠিকমতো পালন করছে কিনা এবং অভিভাবকদের সহযোগিতা কতখানি তা মূল্যায়ন করা।

খাদ্য ও পুষ্টি

ভারতের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যাগুলির মধ্যে অপুষ্টি একটি অন্যতম সমস্যা, আর এই সমস্যার প্রধান শিকার ভারতের অগণিত শিশু ও বালক-বালিকা। ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৪২ ভাগেরই বয়স ১৪ বছরের নিচে, এদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জনই অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছে। শিক্ষার মাধ্যমে এই সমস্যা অনেকটা হ্রাস করানো যায়। পুষ্টি-বিষয়ক ও স্বাস্থ্য-সম্পকীয় শিক্ষাগুলি যদি প্রাথমিক স্তর থেকেই শুরু করা যায় তবে তা অঙ্কুরিত শিশুমনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে এবং আশা করা যায় তাদের পরিবারের মধ্য দিয়ে এই শিক্ষা সমাজের বিভিন্নস্তরের জনগণের মাধ্যমে বিস্তারের ফলে ভবিষ্যতে এক সুস্থ জাতি গঠনে সহায়তা করবে।

দেহকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য প্রত্যেক মানুষেরই খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য দেহের পুষ্টি জোগায় এবং ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে। খাদ্য আমাদের কাজ করার শক্তি জোগায় এবং রোগব্যাধি থেকে মুক্ত রাখে। খাদ্যই শিশুকে পূর্ণবয়স্ক মানুষে পরিণত করে এবং পক্ষান্তরে খাদ্যে পুষ্টির অভাব হলে শরীর দুর্বল হয়। পড়াশুনা ও খেলাধুলোর ব্যাঘাত ঘটে। দীর্ঘকাল অপুষ্টিতে ভুগলে মৃত্যুও হতে পারে।

বিষয়বস্তু

প্রতিদিন আমরা যে সব খাদ্য গ্রহণ করি তার সবগুলোই কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট কিংবা ভিটামিন বা খনিজ লবণ প্রভৃতি নানা খাদ্যগুণ সমৃদ্ধ, দৈহিক বিকাশ শক্তি সঞ্চয় শরীরের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ ও রোগ প্রতিরোধের জন্য দৈনিক খাদ্য তালিকায় উপরোক্ত উপাদানগুলো অবশ্যই থাকা উচিত। এই ধরনের খাদ্যকে বলা হয় সুষম খাদ্য।

এখন প্রতিটি দ্রব্যের গুণাগুণ পৃথকভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা

কার্বহাইড্রেট সমৃদ্ধ খাদ্য আমাদের কাজ করার শক্তি জোগায়। গম, চাল, জোয়ার, ভুট্টা, আলু, রাঙাআলু, চিনি প্রভৃতিতে কার্বোহাইড্রেট সর্বাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

প্রোটিন

শিশুর দৈহিক বিকাশ ও পরিণত বয়স্কদের সুস্থ জীবনযাপনের জন্য প্রোটিন অপরিহার্য। দুধ, ডিম, মাছ, মাংস ইত্যাদি খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে। সব্জির মধ্যে শিম ও শুঁটি জাতীয় তরিতরকারিতে যথেষ্ট প্রোটিন থাকে কিন্তু সেটা শরীরের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তরিতরকারির সঙ্গে চাল, ডাল, গম ইত্যাদি যে কোন খাদ্যশস্য মিলিয়ে খেলে ঘাটতি পূরণ হয়। একথা মনে রাখা করকার যে, উপরোক্ত খাদ্যগুলো নিয়মিত খেলে কৃত্রিম উপায়ে প্রোটিন মিশ্রিত বাজারের কোন খাবার বা পানীয় বা বিস্কুট কিনে খাবার দরকার নেই।

ফ্যাট বা চর্বি

ফ্যাট বা চর্বি জাতীয় খাদ্য আমাদের শক্তির অন্যতম উৎস। বনস্পতি, মাখন, বাদাম, তৈলবীজ থেকে প্রচুর পরিমানে ফ্যাট পাওয়া যায়।

ভিটামিন এবং খনিজ লবণ

ভিটামিন ও খনিজ লবণ সমৃদ্ধ খাদ্য আমাদের শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে। এগুলি খাদ্যের প্রতিরোধকারী উপাদান, সুতরাং এগুলি রোগসংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। প্রধানতঃ শাকসব্জি এবং ফলের মধ্যে ভিটামিন ও খনিজ লবণ পাওয়া যায়।

আমাদের খাদ্য তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিনগুলো হল ভিটামিন এ, বি, সি, ই, কে এবং বি-কমপ্লেক্স। আর প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ, হল আয়রন, ক্যালসিয়াম এবং আয়োডিন ইত্যাদি।

স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য আমাদের প্রত্যেকের খাদ্য তালিকা অবশ্যই সুষম হওয়া উচিত। নিচে একটি পুষ্টিকর এবং সুষম খাদ্যতালিকা দেওয়া হল।

রুটি বা ভাত	**(কার্বোহাইড্রেট)**
ডাল	**(প্রোটিন)**
শাকসব্জি	**(ভিটামিন এবং খনিজ লবণ)**
তেল	**(ফ্যাট) ডাল ও তরিতরকারীর সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া উচিত।**

উপরোক্ত খাদ্যতালিকার খাদ্য আমাদের অনিয়মিতভাবে গ্রহণ বা এগুলির যে কোনো একটির অনুপস্থিতি দেহে অপুষ্টির কারণ ঘটাতে পারে। ছোট ছেলেমেয়েরা সহজেই এই ধরনের অপুষ্টির শিকার হয়।

এখানে আমরা চার রকমের অভাবজনিত রোগ-প্রোটিন শক্তির অভাবে অপুষ্টি, ভিটামিন-এ জনিত ঘাটতি, রক্তাল্পতা এবং গলগন্ড নিয়ে আলোচনা করব।

প্রোটিন শক্তির অভাব জনিত অপুষ্টি

এটি সাধারণতঃ ছয় মাস থেকে তিন বছরের শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। মূলতঃ শক্তি যোগানকারী বা প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্যের অভাব ঘটলে শিশু বয়সে এ রোগ দেখা দেয়।

লক্ষণ ঃ

১। শিশু ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে।

২। সে দুঃস্থ এবং কোপন স্বভাবের হয়ে পড়ে ।

৩। ক্রমশঃ রোগা এবং হাড়-জিরজিরে হতে থাকে ।

৪। চুল কমে আসতে তাকে এবং বাদামী বা সোনালী রঙের হয়ে যায়।

৫। পা ফোলা এবং চামড়া উঠে আসার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে ।

যে সব শিশু উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছে তাদের অবিলম্বে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। তাকে কিছুক্ষণ পর পর অল্প পরিমাণে খিচুড়ি, ভাত, ডাল, অথবা দইভাত খাওয়ানো প্রয়োজন।

ভিটামিন-'এ' অভাবজনিত রোগ

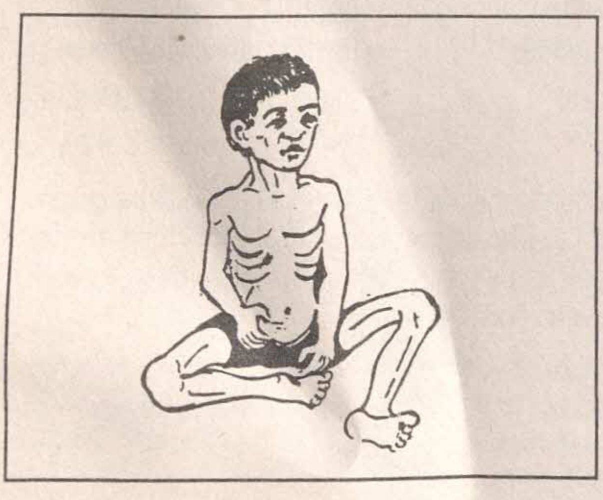
আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা হল ভিটামিন 'এ'র অভাব। বিশেষতঃ এক থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের মধ্যে এটি বেশি দেখা যায়। ঠিক মত চিকিৎসা না হলে এর জন্য অন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

লক্ষণ ঃ

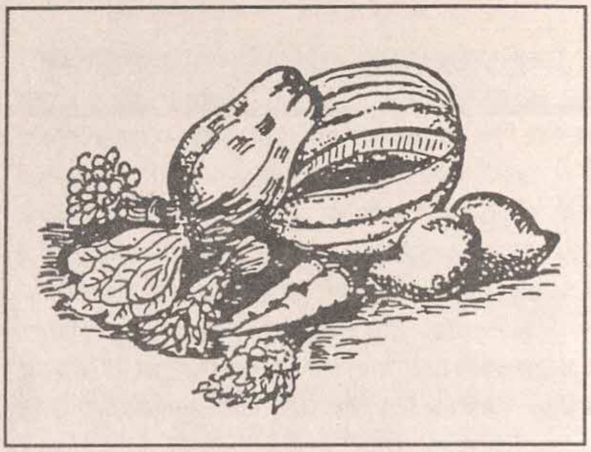
১। অল্প আলোয় বা সূর্যাস্তকালে দেখতে অসুবিধা হয়।

২। চোখের তারা কুঁচকে যায়।

৩। চোখের কোণে বিশেষতঃ, কোণের দিকে ধূসর, সাদা বা হলুদ রঙের ফেনার মত ছোপ দেখা দেয়।



৪। চোখের তারা বিবর্ণ হয় বা ঘা দেখা দেয় এবং এসবের কারণে পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা ব্যাপক।



যদি নিয়মিত ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাদ্য খাওয়া যায় তাহলে এগুলি প্রতিরোধ করা সম্ভব। ভিটামিন-এ জাতীয় খাদ্যগুলি হল ঃ ঘন সবুজপাতাওয়ালা শাক (যেমন ঃ পালং, মেথি, বেথুয়া, সর্ষে ইত্যাদি), হলুদ সব্জি (যেমন ঃ গাজর, কুমড়ো ইত্যাদি), হলুদ, ফল (যেমন ঃ আম, পেঁপে ইত্যাদি) দুধ, ডিম এবং ঘি।

অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা

অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা মূলত আমাদের খাদ্যে আয়রনের ঘাটতির কারণে দেখা দেয়। এছাড়া জীবাণুসংক্রমণের মাধ্যমেও হয়। সাধারণতঃ এই রোগে বাড়ন্ত শিশু, গর্ভবতী এবং অসুস্থ মায়েরাই বেশি ভোগে।

লক্ষণ ঃ

১। রোগী অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়ে।

২। নখ বিবর্ণ এবং চামচের মত হয়ে যায়।

৩। জিভ, ঠোঁটের ভিতরের দিক এবং চোখের তারা বিবর্ণ সাদাটে হতে থাকে।

ঘন সবুজ পাতাওয়ালা শাকসব্জি (যেমন ঃ পালং, মেথি, বেথুয়া, সর্ষে, পুদিনা, সবুজ ধনে) গুড়, ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন পাওয়া যায়। এজন্য প্রতিদিন অবশ্যই শাক, চাটনি, বেথুয়া, মেথি-সব্জি রুটি অথবা ডালের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে রক্তাল্পতা রোধ করা যায়।

গলগন্ড

খাদ্যে আয়োডিনের অভাব দেখা দিলে গলগন্ড রোগ হয়। যে মাটিতে শাকসব্জি এবং ফল জন্মায় সেখানকার মাটিতে

আয়োডিন বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেলে আয়োডিনের অভাব দেখা দেয়। গলগন্ড হিমালয়ের পাদদেশে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে অতি প্রচলিত রোগ।

গলার সামনের দিক ফুলে যাওয়া গলগন্ডরোগের লক্ষণ (থাইরয়েড গ্রন্থি বেড়ে যাওয়ার জন্য এটা হয়।)



নিয়মিত আয়োডিন মিশ্রিত নুন (যে নুনে আয়োডিন মেশানো থাকে) গ্রহণ করলে গলগন্ড হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। সামুদ্রিক খাবার যেমন সমুদ্রের মাছ, আয়োডিনের খুব ভালো উৎস।

কীভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকা উপরোক্ত স্বাস্থ্যবার্তা ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন

১। সুষম খাদ্য তালিকা সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন থাকলে তাঁদের এ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিতে পারেন, যেমন খাদ্য কী? কেন আমরা খাদ্য খাই? ইত্যাদি।

তারপর সমগ্র বিষয়টি তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। আরও সহজ হয় যদি স্কুলের কোনো শিশু অপুষ্টিতে ভোগে, তাহলে তাকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থিত করলে।

২। আকর্ষণীয় গল্পের মাধ্যমে তাঁরা খাদ্যের গুণাগুণ শিশুদের কাছে বলতে পারেন।

৩। শিক্ষক-শিক্ষিকারা ক্লাসরুমে ভিটামিন-এ বা আয়োডিনের রোগ সম্পর্কে ছোট নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন।

৪। রঙিন পোস্টার / চার্ট/ ব্যানার প্রভৃতি ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে তৈরি করানো যেতে পারে। এগুলি ক্লাসেই টাঙিয়ে রাখলে ছাত্র-ছাত্রীদের সবসময়েই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং স্বাস্থ্যবার্তাগুলি সহজেই তাদের কাছে পৌঁছবে।

৫। কীভাবে তাজা শাকসব্জি খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে, কীভাবে স্যালাড তৈরি করা যায়, তা ক্লাসে হাতে কলমে করে দেখানো যায়। গাজর, মুলো, টমাটো, বাঁধাকপি এবং পিঁয়াজ ভালো করে ধুয়ে নিয়ে কাটতে হবে। তারপর লেবুর রসের সঙ্গে সবকিছু মিশিয়ে নিতে হবে। তৈরি হব্যার পর স্যালাড সব শিশুকে খেতে দিতে হবে, যাতে তারা স্বাদ বুঝতে পারে।

৬। ক্লাসের যে সব শিশু ভিটামিন-এ, আয়রন বা আয়োডিনের অভাবে ভুগছে, তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকা পরীক্ষা করে চিহ্ন এবং লক্ষণগুলো অন্যান্য শিশুদের দেখাতে পারেন। আর রোগগ্রস্ত শিশুদের সম্ভব হলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারেন এবং অভিভাবকদের অবহিত করবেন।

শিশুরা কী করতে পারে—

চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা পরস্পরের মধ্যে ভিটামিন-এ, আয়রন, আয়োডিনের অভাবজনিত রোগের চিহ্নগুলো পরীক্ষা করতে পারে। এই একই পরীক্ষা তারা প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ওপরও করতে পারে। রোগগ্রস্ত শিশুদের সম্পর্কেও শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের জানাতে পারে।



২। চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা টিফিনের সময় তাদের খাবার অন্যান্য ছোটদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে

পারে। ছোটরা খাবার আগে হাতধুয়েছে কিনা তা দেখতে হবে। এছাড়া পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে বলবে।



৩। তাজা শাকসব্জির গুরুত্ব অনুভব করে শিশুরা স্কুলে সবজি বাগান তৈরি করতে পারে ।শিক্ষক-শিক্ষিকার পরিচালনায় তারা বীজক্ষেত্র তৈরি করে মুলো, মেথি, বেথুয়া, শালগম প্রভৃতির বীজ বুনতে পারে। এই বাগানের দেখাশোনার দায়দায়িত্ব থাকবে তাদের নিজেদের ওপরে।

৪। পুষ্টি এবং সুষম খাদ্যতালিকা সম্পর্কে তারা পথ-নাটিকা করতে পারে। প্রত্যেককে এই পথ-নাটিকায় অংশগ্রহণ করতে হবে। দর্শকদের মধ্যে থেকে প্রশ্ন করার মত উৎসাহ দিতে হবে। শিশুরা পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, কোন খাদ্যে কী পুষ্টিগুণ আছে তা দর্শকদের বলবে।

মূলায়ন

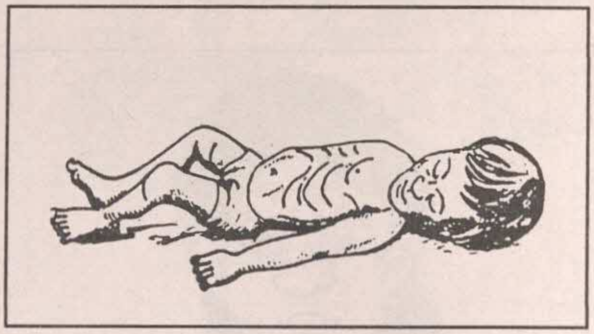
১। বিষয় শেষ হওয়ার পর শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্র-ছাত্রীকে নানা বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করবেন। যদি তাদের মনে কোনো বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ থাকে, তবে শিক্ষক-শিক্ষিকার অবশ্যই বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন।

২। শিক্ষক-শিক্ষিকা অবশ্যই সব্জি বাগানের কী রকম উন্নতি হচ্ছে এবং কেমনভাবে তারা দেখাশোনা করছে তা পরিদর্শন করবেন।

ডায়রিয়া

ধারণা

ডায়রিয়া শিশু এবং ছোট-ছেলেমেয়েদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। একটানা ডায়রিয়া হলে শরীরে জল এবং অন্যান্য খনিজ লবণের ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে শরীর জলশূন্য হয়, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। আমাদের দেশে সাধারণভাবেই এই বিশ্বাস প্রচলিত যে, ডায়রিয়া হলে শিশুকে খেতে দেওয়া উচিত নয়। এরফলে অবস্থা আরও খারাপ হয়। কারণ শিশু আরও জলশূন্য, দুর্বল হতে থাকে এবং শেষে মারা যায়। বাচ্চাদের এবং জনসাধারণকে ডায়রিয়া রোগ সম্পর্কিত শিক্ষাদানের মাধ্যমে সহজেই জলশূন্যতা প্রতিরোধ করা যায়। এতে ডায়রিয়াজনিত মৃত্যু অনেক কম ঘটবে।



বিষয় ঃ

ডায়রিয়া হলে শিশু সারাদিন ঘন ঘন পাতলা পায়খানা করতে থাকে। পাতলা পায়খানা হওয়ায় দেহ থেকে জল বেরিয়ে যায়। এই সময়ে যদি তাকে প্রচুর পরিমাণ চিনি ও লবণ মিশ্রিত জল না দেওয়া হয় তাহলে রোগী জলশূন্য হয়ে অচিরেই মারা যায়।

ঘন ঘন তৃষ্ণা পাওয়া, জিভ শুকনো হওয়া, চোখ ঢুকে যাওয়া, এক বৎসরের নিচে শিশু হলে মাথার তালু বসে যাওয়া প্রভৃতি জলশূন্যতার প্রধান প্রধান লক্ষণ। এছাড়াও চামড়ার টান ভাব চলে যাওয়া, অথবা স্থিতিস্থাপকতা কমে যাওয়া, এবং প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়াও জলশূন্যতার লক্ষণ।

চিকিৎসা

ডায়রিয়ার চিকিৎসা বলতে বোঝায় শিশুকে জলশূন্যতার হাত থেকে বাঁচানো। কারণ পাতলা পায়খানার সঙ্গে কেবল জলই নয়, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খনিজ লবণও বেরিয়ে যায়।

যদি শিশু দিনে তিনবারের বেশি পায়খানা করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ঃ

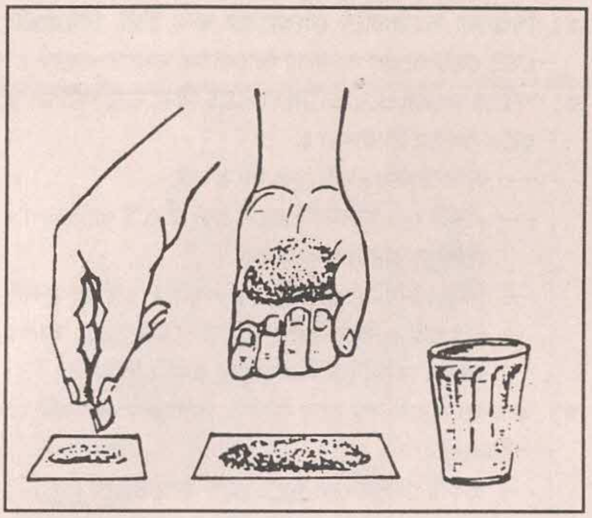
১। শিশুকে অনবরত জল খাওয়াতে হবে। সাদা জল ছাড়াও ORAL REHYDRATION THERAPY অর্থাৎ নুন-চিনির সরবৎ যেটি হল জল, চিনি আর নুনের মিশ্রণ। এটি শরীরে জল এবং নুনের ঘাটতি পূরণ করে।

নুন-চিনির সরবৎ তৈরির পদ্ধতি

ক) এক গ্লাস ফোটানো জল নিন (২৫০ মিলি)।

খ) ঠান্ডা করুন।

গ) দু'চামচ চিনি মেশান। যদি চিনি না পাওয়া যায় তাহলে আখ বা তালের গুড় ব্যবহার করা যেতে পারে।



ঘ) এক চিমটি নুন মেশান (মাপের জন্য বুড়ো আঙ্গুল ও দুটি আঙ্গুল ব্যবহার করুন)।

ঙ) ভালো করে মিশিয়ে নিন।

এই মিশ্রণ শিশুকে সামান্য পরিমাণে নিয়মিত ব্যবধানে অথবা প্রতিবার পায়খানার পর খাওয়াতে হবে। এক ঘণ্টায় অন্ততঃ এক কাপ মিশ্রণ খাওয়ানো উচিত। এই চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। এমনকি রাত্রিবেলাও যদি ডায়রিয়া হয় তবে সারারাত ধরে এই চিকিৎসা করতে হবে।

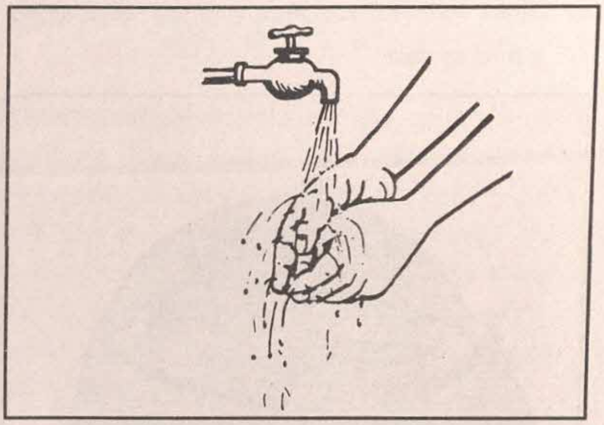
শিশু যদি স্তন্য পান করে, তাহলে এই দুধ বন্ধ করা চলবে না, ডায়রিয়ার চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে দুধ খাইয়ে যাওয়া অত্যন্ত দরকার।

২। নুন-চিনির সরবৎ এর সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে হাল্কা জলীয় খাদ্য অল্প পরিমাণে দেওয়া উচিত। যেমন — তরল খিচুড়ি, দই, ঘোল ইত্যাদি।

৩। যদি পাতলা পায়খানা অনবরত চলতে থাকে অথবা পায়খানার সঙ্গে রক্ত কিংবা শ্লেষ্মা পড়ে তবে শিশুকে খুব শীঘ্রই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। নচেৎ বিপদের আশঙ্কা আছে।

সব থেকে মনে রাখা দরকার ডায়রিয়া রোগের অন্যতম কারণ হল—

১। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ব্যক্তিগত অপরিচ্ছন্নতা, আঢাকা খাবার ইত্যাদি।



২। মলত্যাগের পর ভালোভাবে হাত না ধোয়া। খাবার অথবা জলগ্রহণ করার সময় ময়লা জমে থাকা নখের মাধ্যমে জীবাণু পাকস্থলীতে চলে যায়।

ডায়রিয়া দমন করতে হলে নিম্নোক্ত অভ্যাসগুলি অবশ্যই মেনে চলা উচিত—

১। নখ সবসময় ছোট করে কাটতে হবে ও পরিষ্কার রাখতে হবে।

২। মলত্যাগের পর হাত সাবান ও জল দিয়ে ভালোভাবে ধুতে হবে।

৩। কলসি থেকে জল তোলার জন্য লম্বা হাতলযুক্ত পাত্র ব্যবহার করতে হবে।

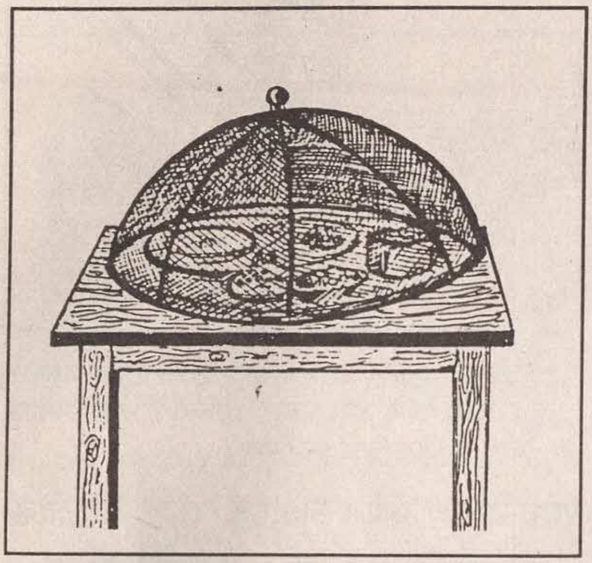


৪। খাবার খাওয়ার আগে ও পরে ভালোভাবে হাত ধুতে হবে।

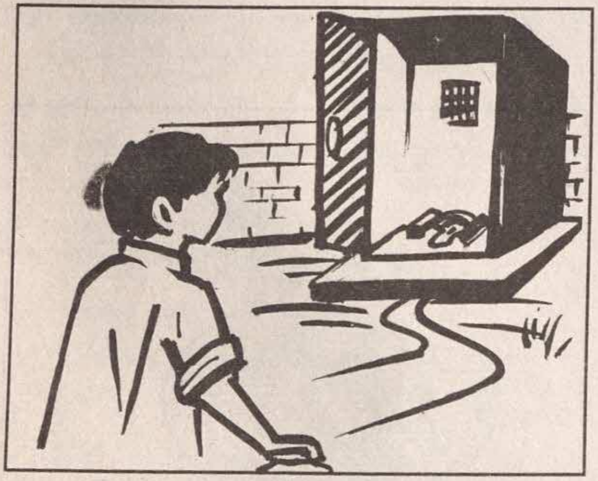
৫। কাঁচা তরকারী কাটার আগে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে।

৬। খাবার সবসময় ঢেকে রাখতে হবে যাতে মাছি, পোকামাকড়, ইঁদুর বসতে না পারে।

৭। রাস্তার ধারে ফেরিওয়ালাদের কাটা ফল, খাবার এড়িয়ে চলা বা না কেনা।



৮। নিয়মিত মলত্যাগ করার জন্য উপযুক্ত পায়খানাঘর ব্যবহার করা উচিত। যদি তা সম্ভব না হয় তবে, মল মাটি চাপা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। যাতে মাছি না বসতে পারে। কারণ মাছির মাধ্যমে রোগজীবাণু ছড়ায়।



কীভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকা স্বাস্থ্যবার্তাগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন

১। শিক্ষক-শিক্ষিকা এই বিষয়গুলি ক্লাসরুমে আলোচনা করতে পারেন। প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমে তিনি শিশুদের কাছ থেকে প্রচুর তথ্য বার করতে পারেন এবং এইভাবেই স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কর্মসূচীতে শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করাতে পারেন।

২। শিশুদের সহজভাবে বোঝানোর জন্য তিনি বিষয়গুলি ছোট ছোট গল্পের আকারে আলোচনা করতে পারেন।

ক) শরীরে জলের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তার পরীক্ষা ও হাতে কলমে শিক্ষাদান ঃ

— লম্বা ডালসহ দুটি ফুল নিতে হবে।

— একটি ফুল জলভর্তি গ্লাসে এবং অন্যটি খালি অর্থাৎ জলশূন্য গ্লাসে রাখতে হবে।

— কিছুক্ষণের মধ্যে খালি (জলশূন্য) গ্লাসের ফুলটি অবশ্যই শুকিয়ে যাবে ও নেতিয়ে পড়বে। কারণ, সজীব বস্তুর জীবনধারণের জন্য চাই জল।

খ) ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে জলের প্রয়োজন কতখানি তা পরীক্ষা করা ঃ

— একটি বেলুন জল দিয়ে ভর্তি করতে হবে।

— ছুঁচলো যন্ত্র দিয়ে বেলুনের উপরে ফুটো করতে হবে।

— জল যত বেরিয়ে যাবে, বেলুনটি ক্রমশঃ চুপসে যাবে।

— তখন আবার জল উপরের ফুটো দিয়ে ঢালতে হবে যাতে পুনরায় বেলুনটি আগের মতই ফুলে ওঠে।

— ঠিক তেমনি, শরীরে জল কোন কারণে কমে গেলে পুনরায় জল দিয়ে তা পূরণ করা প্রয়োজন।

গ) ক্লাসরুমে নুন, চিনির সরবৎ কেমন করে তৈরি করতে হয় তার পদ্ধতি দেখাতে হবে।

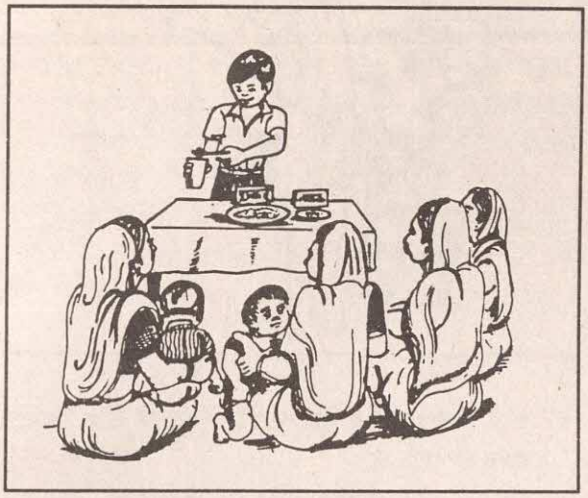
৩। শিক্ষক-শিক্ষিকা এই বিষয়ের উপর শিশুদের দিয়ে নাটক, তাৎক্ষণিক অভিনয় করাতে পারেন। এছাড়া ক্লাসরুমে ডায়রিয়ার লক্ষণ, প্রতিরোধ এবং তৈরির পদ্ধতির উপর শিশুদের মাধ্যমে রঙিন চার্ট, পোস্টার তৈরি করাতে পারেন। এতে শিশুদের এই স্বাস্থ্যশিক্ষামূলক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণে উৎসাহ বাড়বে এবং হাতে কলমে শেখার ফলে অনেক কিছু জানতে পারবে।

৪। এমনকি অভিভাবক ও শিক্ষক যৌথসভায় এই সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে তাদের অবহিত করতে পারেন এবং শিশুরা যা শিখছে তা বাড়িতে পালন করছে কিনা অথবা আলাপ-আলোচনা করে কিনা জিজ্ঞেস করতে পারেন।

শিশুরা কী করতে পারে

১। সন্নিহিত এলাকায় কোনো শিশু যদি ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয় তবে খোঁজ খবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে। যেমন সংগে সংগে ORT

এর ব্যবস্থা করা এবং সেই পরিবারের সবাইকে নুন-চিনির সরবৎ তৈরির পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া যাতে জরুরী অবস্থায় তারা নিজেরাই চিকিৎসা করতে পারেন।



২। অভিভাবক-শিক্ষকমন্ডলীর যে সভা হয় সেখানে শিশুরা তৈরির পদ্ধতি হাতেকলমে করে দেখতে পারে এবং প্রতিবেশী এলাকাতেও জনপ্রিয় করার জন্য মাঝে মাঝেই এই সরবৎ করে দেখানোর ব্যবস্থা করতে পারে।

৩। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য যে সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি আছে সেগুলি নিজের পরিবারে এবং প্রতিবেশী এলাকাতেও পালন করা হচ্ছে কিনা শিশুরা তা খোঁজ খবর নিতে পারে। যেমন——কলসি থেকে জল তুলতে তারা বড় হাতলযুক্ত পাত্র ব্যবহার করছে কিনা, বর্ষাকালে জল ফুটিয়ে ও ছেঁকে ব্যবহার করছে কিনা ইত্যাদি।

৪। রাস্তার ধারে ফেরিওয়ালারা কাটাফল, অন্যান্য খাবার আঢাকা রেখে বিক্রি করছে কিনা সে ব্যাপারে তদারকি করতে পারে এবং তাদেরকেও বোঝাতে পারে আঢাকা খাবার বিক্রির কুফল কী কী।

৫। বিদ্যালয়ে বড় ছেলেমেয়ে যারা আছে তারা অপেক্ষাকৃত কম বয়সের শিশুরা স্বাস্থ্যের নিয়মনীতিগুলো বা ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ঠিকমতো পালন করছে কিনা তা তদারকি করতে পারে।

প্রতিবেশী এলাকায় এবং বিদ্যালয়ে সমাজসেবামূলক কর্মসূচীগুলো শিশুরা ঠিকমতো পরিচালনা করতে পারছে কিনা তার জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ এবং নজরদারি শিক্ষক-শিক্ষিকা অবশ্যই রাখবেন।

ম্যালেরিয়া

অ্যানোফিলিস মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া রোগ হয়। এ রোগ যে কোন বয়সের মানুষকে আক্রমণ করে। বর্তমানে আমাদের দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। এমনকি মারা যাওয়ার ঘটনাও কম নয়। যদি মশার বংশবৃদ্ধি বন্ধ করা যায়, তবেই ম্যালেরিয়া দমন করা সম্ভব। আর এ কাজ করতে গেলে জনসাধারণের সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরী। শিশুরাও ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচীতে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে।

কীভাবে ম্যালেরিয়া ছড়ায়

অ্যানোফিলিস প্রজাতির একপ্রকার মশার কামড় ম্যালেরিয়া রোগের প্রধান কারণ। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত কোন ব্যক্তিকে মশা কামড়ালে রক্তশোষণের মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার জীবাণু এই



মশা বহন করে। ফলে এই জীবাণুবহনকারী মশা যখন অন্য কোন সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ায় তখন সেই ব্যক্তির মধ্যে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশ করে, ফলে তারও ম্যালেরিয়া রোগ হয় এবং ধীরে ধীরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ

— হঠাৎ শীত করে প্রচন্ড কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে।
— ভীষণ মাথার যন্ত্রণা শুরু হয় ও সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।
— তাপমাত্রা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়।

— জ্বর একদিন অন্তর অন্তর আসে। রোগী খুব দুর্বল হয়ে পড়ে, ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে রোগী বারে বারে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং ক্রমশঃ আরও দুর্বল হয়ে যায়।

কীভাবে ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধ করা হয়

যেহেতু ম্যালেরিয়া রোগ মশার কামড় দ্বারা ছড়ায়, তাই প্রথমেই দরকার যে সব জায়গায় মশা জন্মায় সে সব জায়গায় ওষুধ ছড়িয়ে মশার বৃদ্ধি ধ্বংস করা। মশা সাধারণতঃ বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে এবং এই ডিম থেকে লার্ভা ধীরে ধীরে বড় হয়। পুকুর, খানা, ডোবা, এবং যেখানে সেখানে জমে থাকা জল মশা জন্মাবার আদর্শ স্থল। অন্ধকারাচ্ছন্ন স্যাঁতসেঁতে ঘরে মশার প্রবেশ বেশি দেখা যায়। তাই মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নিতে হবে ঃ

১। বৃষ্টির জল যাতে না জমতে পারে তার জন্য খানাখন্দ, গর্ত, ডোবা বুজিয়ে ফেলতে হবে।



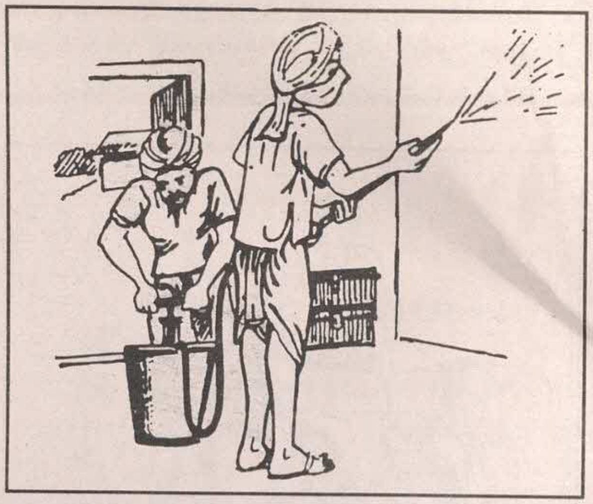
২। জল নিষ্কাশনের জন্য সরু নালা মাঠের দিকে কেটে দিতে হবে যাতে বৃষ্টির জল বয়ে যেতে পারে।

৩। কীটনাশক ঔষধ বাড়ির ভিতর ও চারপাশে নিয়মিত ছড়াতে হবে। যাতে মশা আর না জন্মাতে পারে।

৪। প্রতিসপ্তাহে অন্ততঃ পুকুর ও নর্দমাগুলোতে ডিজেল বা কেরোসিন ছড়াতে হবে।

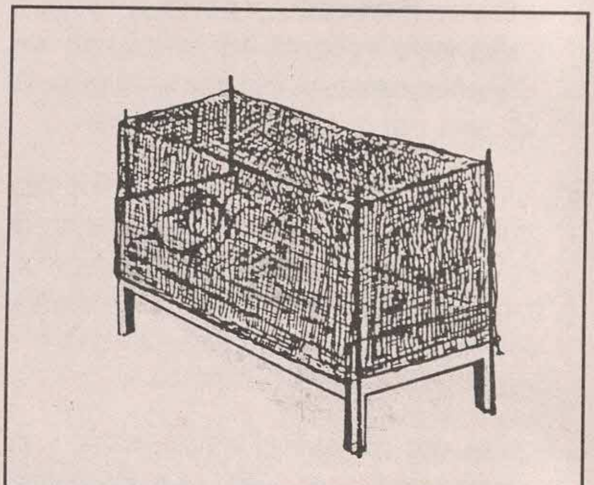
৫। মাঝে মাঝে নিমপাতা ঘরে জ্বালতে হবে যাতে মশার উপদ্রব কমে।

৬। মাটির কলসি কিংবা ড্রামের জল ঢেকে রাখতে হবে।



৭। ঘরে মশার প্রবেশ বন্ধ করতে জানালায় এবং দরজায় জাল লাগাতে হবে।

৮। শোবার সময় মশারী ব্যবহার করতে হবে।



চিকিৎসা

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুসরণ করলে ম্যালেরিয়া ভালভাবে দমন করা যায় ঃ

— স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে জ্বরসংক্রান্ত রিপোর্ট নিয়মিত দিতে হবে যাতে তিনি প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারেন।

— রক্তপরীক্ষা করতে হবে।

— স্বাস্থ্যকর্মীর কাছ থেকে ক্লোরোকুইন ট্যাবলেট নিতে হবে এবং নিয়মিত খেতে হবে।

— যদি রক্ত পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে এই জ্বর ম্যালেরিয়ার লক্ষণ, তবে অবিলম্বে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

কীভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীদের পরামর্শ দিতে পারেন —

১। গত এক বছরের মধ্যে কোন শিশুর ম্যালেরিয়া হয়ে থাকলে তাকে উদাহরণস্বরূপ ক্লাসরুমে আনা যেতে পারে এবং তার অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষক-শিক্ষিকা আলোচনা করতে পারেন। উদাহরণ সহযোগে স্বাস্থ্যশিক্ষা পদ্ধতি অত্যন্ত কার্য্যকরী ও এতে শিশুদেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ পাওয়া যায়।

২। গ্রামাঞ্চলে যে সব জায়গায় জল জমে বা বদ্ধ অবস্থায় থাকে সে সব জায়গাগুলি শিশুদের নিয়ে পরিদর্শন করা যেতে পারে। এতে শিশুদের উৎসাহ বাড়ে এবং কাজে প্রেরণা আসে।

৩। ম্যালেরিয়ার লক্ষণ এবং প্রতিরোধের ওপর বিভিন্ন চার্ট তৈরি করে জায়গায় জায়গায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৪। ছোট ছোট স্লোগান এবং ব্যানার কাপড়ের উপর বা কাগজে লিখে বিভিন্ন জায়গায় টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে যাতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।

শিশুরা কী করতে পারে

১। ম্যালেরিয়া রোগ এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে শিশুদের ধারণা গড়েছে কিনা তা প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষিক/শিক্ষিকা জিজ্ঞাসা করতে পারেন

কৃমিসংক্রমণ

আমাদের দেশের শিশুরা নানাধরনের কৃমি রোগে আক্রান্ত হয়। কৃমি আমাদের শরীরে অন্ত্রের মধ্যে বাস করে। সেখানেই বেঁচে থাকে, এটা দ্বিগুণ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরকে আক্রমণ করে। কৃমিসংক্রমণ শিশুদের অপুষ্টির একটি অন্যতম কারণ। শিশুদের ফোলা পেট, রোগা হাত-পা, রক্তাল্পতা, খিদের অভাব ইত্যাদি লক্ষণ দেখা গেলে বুঝতে হবে কৃমিসংক্রমণ হয়েছে। এমনিতেই আমাদের দেশে বেশির ভাগ লোক বিশেষত শিশুরা অপুষ্টিতে ভোগে, তার উপর কৃমির সংক্রমণ সেই অপুষ্টিকে আরও প্রকট করে তোলে।

বিভিন্ন ধরনের কৃমি

সাধারণত যে সব কৃমি মানুষের শরীরে বাসা বাঁধে তার মধ্যে গোলকৃমি, সুতোকৃমি, হুককৃমিই প্রধান। জল বা খাদ্যের মাধ্যমে এই কৃমিগুলির ডিম অথবা অপরিণত লার্ভাগুলি অতি সহজেই আমাদের শরীরে প্রবেশ করে ও সংক্রমণ ঘটায়। এই তিন ধরনের কৃমিই আমাদের অন্ত্রে বেঁচে থাকে, এবং প্রতিবারই পায়খানার সঙ্গে বেরিয়ে আসে। এই পায়খানা যদি কোনভাবে পানীয় জলের সংস্পর্শে আসে তবে সেই জল দূষিত হয় অথবা যেখানে সেখানে পায়খানা করলে মাটির মধ্যেও এই কৃমির ডিম অথবা লার্ভাগুলি মিশে থাকে এবং মাটি দূষিত হয়। এই মাটিতে যে ফসল জন্মায় তাতেও কৃমিগুলি লেগে থাকে এবং খাদ্যের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে।

গোলকৃমি (রাউন্ডকৃমি)

এই কৃমিগুলিই বেশি দেখা যায়। এগুলি অনেকটা গোলাপী আভাযুক্ত ধূসর রঙের চকচকে লম্বা নলের মত দেখতে হয়। একটি পরিণত স্ত্রী-কৃমি ১২-১৪ ইঞ্চির মত লম্বা হয়। এই ধরনের কৃমির সংক্রমণ ঘটলে পাকস্থলীতে যন্ত্রণা হয়, ক্ষিধে কমে যায়, শরীর দুর্বল ও ফ্যাকাশে হয়।

সুতোকৃমি

এই ধরনের কৃমিগুলি সাধারণতঃ সাদাসুতোর ন্যায় ক্ষুদ্রাকৃতি হয়ে থাকে। লম্বায় প্রায় আধ ইঞ্চির মতো। স্ত্রী-কৃমিগুলি রাত্রিবেলা ডিমপাড়ার জন্য মলদ্বারের চারপাশে বেরিয়ে আসে। যে কারণে মলদ্বারে অস্বস্তিকর চুলকানি দেখা দেয়। সেজন্য রাত্রে পরে থাকা জামাকাপড়, বিছানায় ডিমগুলি মিশে থাকে। মলদ্বারে চুলকানির জন্য কিংবা সংক্রামিত কাপড়চোপড়ে সংস্পর্শে আসার জন্য শিশুদের হাতের আঙুল বা নখের মধ্যে এই কৃমিগুলি আটকে থাকে এবং সহজেই খাদ্যের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। এই কৃমিগুলি তেমন বিপজ্জনক নয় তবু কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায়। যেমন — অস্থিরতা, চুলকানি, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানো, ক্ষিধে কমে যাওয়া অথবা খিঁচুনি মতো হতে পারে। এরোগ একজনের হলে পরিবারে অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে সহজেই ছড়িয়ে পড়ে।

হুককৃমি

এই ধরনের কৃমিগুলি সুতোর ন্যায় লম্বা, নলাকৃতি ও রঙ লাল হয়। পরিণত হুককৃমি সাধারণত মলের সংগে বেরোতে দেখা যায় না। তাই এই কৃমি অন্ত্রে আছে কিনা জানার জন্য মল পরীক্ষা অত্যন্ত জরুরি। মাটিতে বা ঘাসে থাকা বাচ্চাকৃমি পায়ের চামড়া ফুটো করে শরীরে প্রবেশ করে। এছাড়া খাদ্য বা পানীয়ের সংগেও শরীরে প্রবেশ করে। এই কৃমির মুখে বাঁকানো হুকের ন্যায় চারটি দাঁত থাকে যার সাহায্যে অন্ত্রের দেওয়ালে আটকে থাকতে পারে। চিকিৎসা না হলে কৃমি মানুষের শরীরে ১৩ বৎসর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। ক্ষুদ্রান্ত্রে ঝিল্লীতে কামড়ে বসে থাকে এবং রক্ত শোষণ করে। পরে পুরানো জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় কামড়ে থাকে।

দেহে এই কৃমির সংখ্যা যত বেশি হবে, রক্তক্ষয়ের পরিমাণও তত বাড়বে। তাই হুককৃমির সংখ্যাধিক্যের সংগে শরীরের অসুস্থতা সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। রক্তাল্পতা, পেটে যন্ত্রণা,

ফ্যাকাশে চোখমুখ, কোষ্ঠবদ্ধতা, পা ফোলা, অজীর্ন, বুক দুরুদুরু করা, জিভ ব্লটিং পেপারের মতো সাদা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি এই রোগের লক্ষণ। এই কৃমিসংক্রমণে অন্যান্য সংক্রামক রোগের আক্রমণও সহজতর হয়। হুককৃমিজনিত রক্তাল্পতা আমাদের দেশে প্রধানত গ্রামাঞ্চলে জনস্বাস্থ্যের অন্যতম প্রধান সমস্যা।

চিকিৎসা

উপরে উল্লিখিত কৃমিসংক্রমণের কোন একটি লক্ষন ও চিহ্ন দেখা দিলে তার যথাযথ চিকিৎসার প্রয়োজন।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা

কৃমি প্রতিরোধের জন্য ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিষয়গুলির উপর বিশেষভাবে জোর দিতে হবে। যেহেতু কৃমিসংক্রমণ জল ও খাদ্যের সংগে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত তাই এই দুটি জিনিস যাতে কোনভাবেই মলদ্বারা দুষিত না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। তার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থার কথা এখানে বলা হচ্ছে।

১। মলমূত্র ত্যাগের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পাকা পায়খানা করার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং জলের সুব্যবস্থা রাখতে হবে।

২। মলত্যাগের পর খাওয়ার আগে, খাবার তৈরি অথবা খাবার পরিবেশন করার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া দরকার।

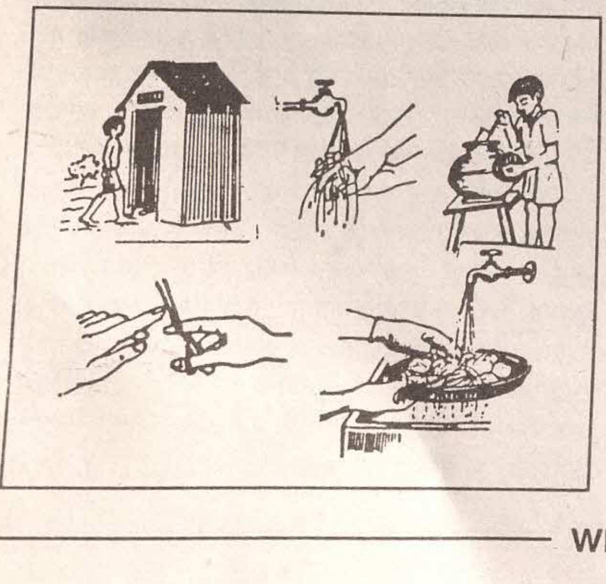
৩। নখ ছোট ছোট করে কাটতে হবে ও পরিষ্কার রাখতে হবে।

৪। যেসব অঞ্চলে হুকওয়ার্ম পাওয়া যায় সেখানে খালি পায়ে চলাফেরা বন্ধ করতে হবে।

৫। যেহেতু শাকসবজিতে কৃমির ডিম লেগে থাকে সেজন্য রান্নার আগে ভালো করে শাকসবজি ধুয়ে নিতে হবে।

৬। পানীয় জলের কলসি থেকে জল তোলার জন্য লম্বা হাতলযুক্ত চামচ ব্যবহার করতে হবে।

৭। নিয়মিত স্নান, পরিষ্কার জামাকাপড় পরা অত্যন্ত জরুরি।



৮। পানীয় জলের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সজাগ থাকা দরকার। কেবল পানীয় জল নয়, থালাবাসন, গ্লাস ও হাত ধোওয়ার জন্যও পরিষ্কার জলের প্রয়োজন।

৯। সবশেষে, পরিবারের একজনের কৃমিরোগ দেখা দিলে অন্যান্য ব্যক্তিদেরও চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষক-শিক্ষিকা কীভাবে স্বাস্থ্যশিক্ষার এই বিষয়গুলি শেখাবেন

১। ক্লাসরুমে উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর আলোচনায় শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করাতে পারেন।

২। গ্রামাঞ্চলে যেসব জায়গা সাধারণত মলত্যাগ করার জন্য ব্যবহার করা হয় এবং তা থেকে কীভাবে জল ও মাটি দূষণ হয় সে সম্পর্কে শিশুদের বিশেষভাবে উদাহরণ দিয়ে অবহিত করতে পারেন।

৩। কবিতা রচনা, স্লোগান তৈরি, তাৎক্ষণিক নাটকের আয়োজন করে স্বাস্থ্যশিক্ষার বিষয়গুলি আরও চিত্তাকর্ষক করে তুলতে পারেন যাতে শিশুরা হাতে কলমে শিখতে পারে।

শিশুরা কি করতে পারে

১। বয়স্ক শিশুরা অপেক্ষাকৃত কম বয়সের শিশুদের মধ্যে কৃমিসংক্রমণ হয়েছে কি না তা চিহ্ন ও লক্ষণ দেখে পরীক্ষা করতে পারে এবং এসব রোগ যাতে না হয় তার জন্য পরিচ্ছন্ন পায়খানা ঘর ব্যবহারের উপযুক্ত নিয়মাবলী সম্পর্কে শিশুদের বোঝাবে।

২। শিশুরা তাদের নিজেদের পরিবারের মধ্যে এবং প্রতিবেশী এলাকায় কৃমিসংক্রমণের প্রাদুর্ভাব আছে কিনা তা সমীক্ষা করতে পারে এবং তাদেরকে চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষা ও পরামর্শ দিতে পারে।

৩। পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গ্রামে গ্রামে প্রভাত ফেরীর মাধ্যমে জনজাগরণ আনার চেষ্টা করা যেতে পারে।

৪। শিশুরা নিজ নিজ এলাকার যুবক-যুবতী এবং পাড়ার গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের নিয়ে দূষণমুক্ত পরিবেশের উপর প্রচার অভিযানের আয়োজন করতে পারে।

মূল্যায়ন

১। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষক–শিক্ষিকা শিশুদের 'কৃমিসংক্রমণ' সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছে কিনা তা মূল্যায়ন করতে পারেন।

২। শিক্ষক-শিক্ষিকা বয়স্ক শিশুরা অপেক্ষাকৃত কম বয়সের শিশুদের স্বাস্থ্যশিক্ষা ঠিকমতো দিচ্ছে কিনা বা পারছে কিনা তা তদারকের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে পারেন।

৩। অথবা শিক্ষক-শিক্ষিকা শিশুদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসগুলি গড়ে উঠেছে কি না তা নিজেরাই পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা

যেসমস্ত কারণে পরিবেশ দূষিত হয় সেসমস্ত বিষয়গুলির দূরীকরণ ও যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার উন্নতি ঘটে। এজন্য প্রথমেই দরকার পানীয় জলের সুব্যবস্থা ও জঞ্জালের স্বাস্থ্যসম্মত অপসারণ।

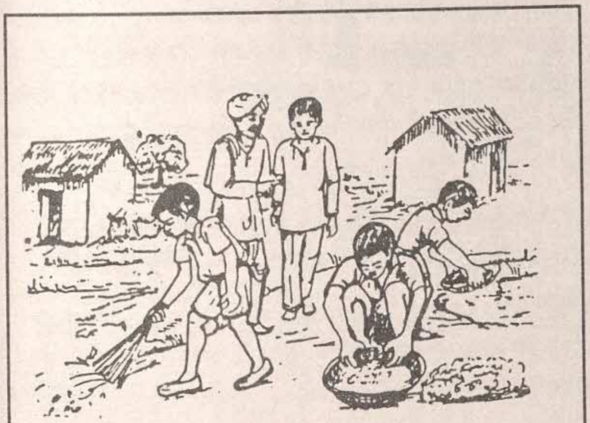
বিষয় ঃ

যেখানে যেখানে অস্বাস্থ্যকর উপায়ে আবর্জনার স্তূপ করে রাখার কুফল অপরিচ্ছন্ন সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি ও স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা।

জঞ্জাল বা আর্বজনা বলতে সাধারণত বোঝায়

১। গৃহস্থালীর নানাবিধ আবর্জনা যেমন শাকসবজির খোসা, উচ্ছিষ্ট, মাছমাংসর কাঁটা ও দেহাবশেষ, পচা বাসি খাবার ইত্যাদি।

২। শুষ্ক আবর্জনা যেমন ছেঁড়া অব্যবহৃত কাগজপত্র, উনুনের ছাই, কাঠ কয়লার গুড়ো বা অংশ ইত্যাদি।



৩। বাগানের যাবতীয় আবর্জনা অর্থাৎ গাছের পাতা, ভাঙা ডালপালা, ইত্যাদি।

৪। নর্দমার জল, যেমন রন্ধনকার্যে ব্যবহৃত জল, পায়খানা ঘরের ব্যবহৃত জল ও স্নানের ব্যবহৃত জল।

৫। বাড়ির আশেপাশে মলত্যাগ অথবা বাড়ির বাচ্চাদের মল আবজর্নার সংগে মিশে থাকা।

এইসব আবর্জনার নিরাপদ অপসারণ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গঠন ও সুস্থ জীবনধারণের পক্ষে সহায়ক। রাস্তার ধারে পড়ে থাকা অথবা প্রতিবেশী এলাকায় এইরূপ স্তূপীকৃত জঞ্জাল থেকে ইঁদুর, মাছি, ক্ষতিকারক পোকামাকড় জন্মায় ও ছড়ায়। তাছাড়া আবর্জনা থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায় যা রুচিসম্মত নয়। এইরূপ আবর্জনার স্তূপে জীবাণু দ্বিগুণ আকারে জন্মায় আর সেই জীবাণু মশা, মাছি, আরশোলা প্রভৃতি পোকামাকড় দ্বারা মানুষের শরীরে সংক্রামিত হয়। এছাড়া যেখানে সেখানে মলত্যাগ, উন্মুক্ত নর্দমার কারণে পুকুর, টিউবওয়েল, কুয়ো প্রভৃতির জলও দুষিত হয়। এবং মাটি দূষণের ফলে শাকসব্জি, ফসলও দূষিত হয় ও জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়।

পারিপার্শিক পরিবেশ ও স্বাস্থ্যরক্ষার কতকগুলি উপায় নিম্নে চিহ্নিত করা হল যা পাড়াপ্রতিবেশী এলাকার উদ্যোগী সদস্যরা এলাকাকে দূষণমুক্ত করার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

বাড়ির আবর্জনা অপসারণের নিরাপদ ব্যবস্থা

১। বাড়ির আবর্জনা ফেলার জন্য একটি নির্দিষ্ট ঝুড়ি বা টিন ব্যবহার করতে হবে। রান্নাঘরের ময়লা ফেলার জন্য আলাদা একটি টিন থাকবে যা সবসময় রান্নাঘরেই থাকবে। ঠিক তেমনি বিদ্যালয়ের ক্লাসরুমেও ময়লা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট ঝুড়ি থাকবে।



২। এই ময়লার ঝুড়ি প্রতিদিন পরিষ্কার রাখতে হবে। এগুলিতে প্রতিদিন নোংরা আর্বজনা জমা করে বাইরে যেখানে ময়লা ফেলার জায়গা করা হবে সেখানে নিয়মিত ফেলতে হবে। যাতে পরিবেশ দূষণ না হয়।

৩। নোংরা আবর্জনা কখনই রাস্তায়, নর্দমায় বা প্রতিবেশীদের এলাকায় ছুঁড়ে ফেলা উচিত নয়। জমা জঞ্জাল ফেলার জন্য যদি পঞ্চায়েত বা স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠানের কোন

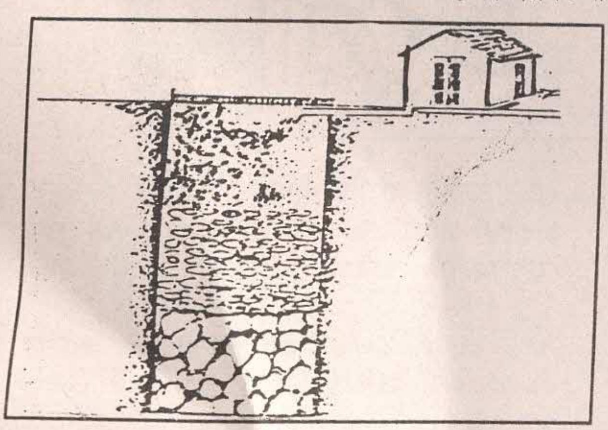
ব্যবস্থা না থাকে তবে সমষ্টির মানুষদেরই দায়িত্ব নিতে হবে ময়লা অপসারণে, যাতে দূরে কোথাও ফেলা যায়। গ্রামাঞ্চলে এই আবর্জনা থেকে সার উৎপন্ন করা যায়। তার জন্য ময়লা ফেলার একটি গর্ত খুঁড়তে হবে যার মাপ ৩ ফুট x ৩ ফুট x ৩ ফুট হওয়া ভালো এবং অবশ্যই তা বাসস্থান থেকে দূরে হবে ও খাবার জলের উৎস থেকে অন্ততঃ ২৫ হাত দূরে খুঁড়তে হবে। প্রতিদিন ময়লা এখানে জমা হবে। এই মাপের একটি গর্তে একটি পরিবারের অন্তত আট দিনের আবর্জনা জমা হতে পারে।

অথবা একাধিক পরিবারের জন্য গর্তটিকে বড় করা যায়। সারাদিনের ময়লা জমা হবার পর উপরে মাটি ছড়িয়ে দিতে হবে। যখন এটি ভর্তি হবে তখন অনুরূপ আরো একটি গর্ত খুঁড়তে হবে। আগের গর্তটিতে সার তৈরী হবার পর খালি করে দিতে হবে এবং পুনরায় ওটি আবর্জনা ফেলার জন্য ব্যবহার করতে হবে। পরের গর্ত থেকে সার তুলে নিয়ে খালি করে দিতে হবে। এইভাবে দুটি গর্ত ময়লা ফেলা ও সার তৈরির কাজে ব্যবহার করতে হবে।



নোংরা জল নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত

নোংরা জলের উৎস সাধারণতঃ বাথরুম, রান্নাঘর ইত্যাদি জায়গায়। যদি এই সমস্ত জায়গার জল ঠিকমতো নিষ্কাশিত না হয়, তাহলে সেখানে মশা জন্মায়, যা থেকে ম্যালেরিয়া ছড়ায়।



নোংরা জল নিষ্কাশনের জন্য যদি নর্দমার বন্দোবস্ত না থাকে তাহলে তা বার করার জন্য সোকেজ পিটের নির্মাণ আবশ্যিক।

সোকেজ পিট তৈরীর জন্য ছয় ফুট গভীর এবং তিন ফুট লম্বা মাপের গর্ত খুঁড়ে সেটিকে ছোট ছোট পাথর এবং নুড়ি দিয়ে একদম ওপর পর্যন্ত ভর্তি করতে হবে। ড্রেনের মতোই এই পিটের মধ্য দিয়ে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। নোংরা জল চুঁইয়ে মাটিতে পড়লে, মাটি তা শুষে নেবে। তবে সোকেজ পিট যেন খাবার জলের উৎসের কাছাকাছি না হয়, সেদিকে নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এছাড়া সব্জি বাগান বা মাঠেও সব্জি ভালো ফলনের জন্য উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালী মারফত নোংরা জল প্রবাহিত করার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে।

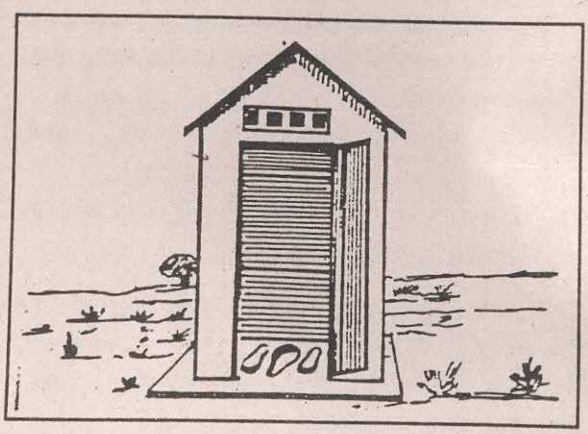
কোনো নীচু জায়গায় জল জমা হলে পাথর, মাটি বা বালি দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে।

মল অপসারণের সুবন্দোবস্ত

সাধারণতঃ দেখা যায় গ্রামের মানুষ মলত্যাগের জন্য মাঠ ব্যবহার করে। যদি এই মল ঠিক মতো অপসারিত না হয়, তাহলে তা থেকে নানাধরনের সংক্রমণ ঘটতে পারে। যেমন মলের ওপর মাছি বসে, সেই মাছি আবার খাবারে বসলে, তার থেকে ডায়রিয়া, আমাশা, কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগ ছড়ায়।

মল আশপাশের পানীয় জলের উৎস যেমন পুকুর বা কুয়োর জলে মিশে রোগের জীবাণু ছড়ায়।

মাঠের শাক সব্জিতে জীবাণু এবং কৃমির ডিম মিশে যায় এবং সেগুলো কাঁচা খেলে জীবাণু ও কৃমি সংক্রমনের আশাঙ্কা থাকে।



সুতরাং মল ঠিকমতো অপসারণ হওয়া খুবই জরুরী। মাটিতে দশ বারো ফুট গর্ত খুঁড়ে পিট পায়খানা নির্মাণ করা যেতে পারে। এর ওপরে বসবার জায়গা সহ সিমেন্টের প্লাটফর্ম বানিয়ে নেওয়া যায়। এই ধরনের পায়খানা নির্মাণের সময় পানীয় জলের উৎসের থেকে তা অন্ততঃ কুড়ি মিটার দূরত্বে তৈরী করা উচিত, যাতে মল মাটির জলের সঙ্গে মিশে সংক্রমণ না ঘটাতে পারে।

নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা

পানীয় জল সব সময়েই পরিষ্কার এবং নিরাপদ অর্থাৎ জীবাণু মুক্ত হওয়া উচিত। পানীয় জল তখনই দূষিত হয়, যখন মানুষ কুয়ো বা পুকুরের জলে মলত্যাগ, স্নান, বাসনপত্র বা কাপড় জামা ধোয়াধুয়ি করে। আবার পানীয় জল অপরিষ্কার আঢাকা পাত্রে রাখলে এবং জল নেবার সময় এঁটো হাত ডোবালেও, তা পুনরায় দূষিত হয়। পানীয় জলকে জীবাণুমুক্ত রাখতে হলে যেগুলি অবশ্য করণীয় তা হল



(ক) পানীয় জলে মলত্যাগ, স্নান বা জিনিসপত্র ধোয়া চলবে না।

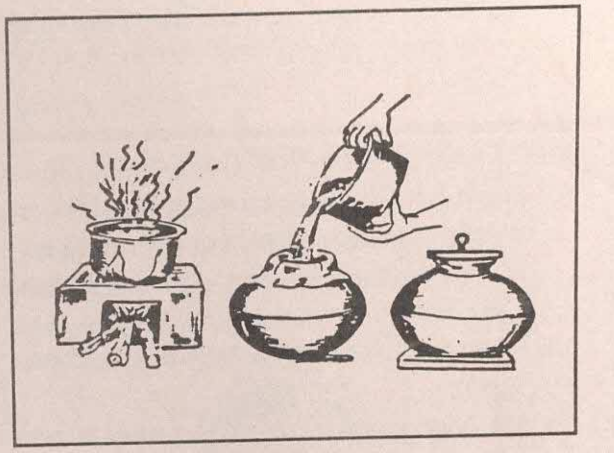
(খ) পানীয় জলের উৎস উপযুক্ত রূপে আচ্ছাদান থাকতে হবে।

(গ) কুয়োর জলে নিয়মিত ভাবে ক্লোরিন দিতে হবে।

(ঘ) পানীয় জল সর্বদা পরিষ্কার এবং ঢাকা দেওয়া পাত্রে রাখতে হবে।

(ঙ) পানীয় জল তোলার জন্য লম্বা হাতলযুক্ত মগ ব্যবহার করতে হবে।

যদি পানীয় জল জীবাণুযুক্ত জায়গা থেকে নেওয়া হয় তাহলে অবশ্যই তা ফুটিয়ে ঠান্ডা করে, পাতলা পরিষ্কার কাপড় দ্বারা ফিল্টার করে নিয়ে ব্যবহার করতে হবে।



কীভাবে শিক্ষক শিক্ষিকা বিষয়টি বোঝাতে পারেন

১) শিক্ষক-শিক্ষিকা বিষয়টি বোঝানোর জন্য শিশুদের পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে নানা ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন, যেমন—কোথায় তোমরা আবর্জনা ফেলো? কোথায় মলত্যাগ কর? কিভাবে নোংরা জলকে কাজে লাগাও ইত্যাদি।

স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার প্রধান চারটি দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে শিশুদের কাছে প্রতিবেশীদের উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

২) শিক্ষক-শিক্ষিকা স্কুলের আবর্জনার সঠিক বন্দোবস্তের জন্য প্রত্যেক শ্রেনীতে একটি ঝুড়ি রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন, যাতে আবর্জনা ফেলা হবে (এরজন্য বাতিল টিন বা ঝুড়ি ব্যবহার করা যেতে পারে) এছাড়া শিশুদের সঙ্গে নিয়ে বিদ্যালয়ের চারপাশের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ খুঁজে, তা স্বাস্থ্যকর করে তোলার ব্যবস্থা করতে পারেন।

৩) শিশুদের নিয়ে গ্রামে গিয়ে দেখতে পারেন, কোথায় কোথায় পিট, নর্দমা বা নিচু জায়গায় জল জমে, আবর্জনা উপচে পড়ে, পানীয় জলে মল মিশে গিয়ে পরিবেশ দূষিত হয়েছে। তিনি তখন কীভাবে এগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয় এবং কীভাবে পরিবেশ স্বাস্থ্যকর রাখা যায় সে সম্পর্কে বুঝিয়ে বলতে পারেন।

৪) পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা ভিত্তিক ছোট ছোট স্লোগান, কবিতা বা গান রচনায় শিশুদের সাহায্য করতে পারেন। এছাড়া শ্রেণীতে শিশুদের দ্বারাই নাটক এবং পুতুল নাচের ব্যবস্থা করতে পারেন।

৫) পরিবেশের পরিচ্ছন্নতার ওপর বিভিন্ন ধরনের চার্ট বা পোস্টার তৈরীতে শিশুদের সাহায্য করতে পারেন।

শিশুরা কী করতে পারে

১) খেলার মাঠ ও শ্রেণী পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব শিশুদের। আবর্জনা ফেলার জন্য অবশ্যই ঝুড়ি ব্যবহার করতে হবে। এ প্রসঙ্গে শিশুদের নিয়ে নানা কর্মসূচী তৈরী করতে হবে।

২) বিদ্যালয়ে একটি আবজর্নার পিট থাকবে যা তৈরী করবে শিশুরাই।

খ) যদি নোংরা জল নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সোকেজ পিট নির্মাণ করতে হবে।

গ) শিশুরা অবশ্যই পায়খানা ব্যবহার করে, তারপর ভালোভাবে হাত ধোবে।

ঙ) যে কোনো শুকনো পাতা বা আবজর্না বিদ্যালয়ের চারপাশে থাকলে সেগুলো একত্র করে জ্বালানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

চ) নোংরা জল সব্জি বাগানের ফলনের কাজে লাগাতে হবে। প্রত্যেক শ্রেণী একটি করে সব্জি জমি তৈরী করবে।

এই সমস্ত কাজকর্মের জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ের শিশুদের কর্তব্য হল —

১) প্রত্যেক স্কুলে পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ পালন করতে হবে এবং সমস্ত শিশুকে এতে যোগদান করতে হবে।

২) একটু বড় শিশুরা ছোটদের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার কাজে সাহায্য করবে।

৩) বিদ্যালয়ের সারাদিনের ব্যবহৃত জল সংলগ্ন সব্জি বাগানে গাছ লাগানো কাজে ব্যবহার করতে হবে।

এই কর্মসূচী রূপায়নের জন্য শিশুদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দিতে হবে, যেমন-

১) কোন একটি সপ্তাহকে "পরিচ্ছন্ন সপ্তাহ" রূপে শিশুরা পালন করতে পারে যেখানে সব শিশুরা অংশ নেবে।

২) একটু বড় শিশুরা অপেক্ষাকৃত কম বয়সের শিশুদের বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন রাখার ও শৌচাগার ব্যবহারের নিয়মাবলী শেখাবে।

৩) স্বাস্থ্যশিক্ষার উপর আকর্ষণীয় স্লোগান তৈরি করে মাঝে মাঝেই গ্রামে 'প্রভাতফেরী' করতে পারে। এভাবে গ্রামগুলিতে বার বার ঘুরে গ্রামবাসীদের পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার উপর গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করতে হবে।

৪) নিজ নিজ এলাকার ৬/৭ টা বিশেষ জায়গা বেছে নিয়ে পথ নাটিকার মাধ্যমে শিশুরা এলাকার মানুষদের মধ্যে স্বাস্থ্যশিক্ষার বিষয়গুলি আরও ভালোভাবে প্রচার করতে পারে। নাটক, গান বা ছড়ার আকারে স্বাস্থ্যশিক্ষা অনেক বেশি কার্যকরী হবে এবং সহজবোধ্য হবে।

৫) শিশুরা বিদ্যালয়গৃহের চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে। এব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। শিশুদের সংঘবদ্ধ করা ও তাদের কাজে উৎসাহদান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রধান কাজ। মশা জন্মাতে পারে এমন খানা, খন্দ, ডোবা থাকলে সেগুলি বুজিয়ে ফেলা, গাছের শুকনো পাতা, গাছের ভাঙা ডালপালা, ঝোপজঙ্গল পরিষ্কার ইত্যাদি শিশুরা করতে পারে।

এব্যাপারে শিশুরা স্থানীয় মানুষদের কাছে সাহায্য নিতে পারে তাদের কাজে সহায়তা করার জন্য।

মূল্যায়ন

১। পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার উপর বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের সচেতনতা গড়ে উঠেছে কিনা তা নির্ধারণ করা যায়।

২। বিদ্যালয়ে পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার উপর রচনা প্রতিযোগিতা, প্রশ্ন-উত্তরের আসর এবং তৎসহ পুরস্কার প্রদানের আয়োজন করে শিশুদের এ সম্পর্কে জ্ঞান হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করা যায়।

৩। নিজ নিজ পরিবারের মধ্যেও শিশুরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখে কিনা সে সম্পর্কে অভিভাবকদের জিজ্ঞাসাবাদ করেও উপরোক্ত কার্যসূচীর মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

প্রতিষেধকের সাহায্যে রোগ প্রতিরোধ

আমাদের দেশে শিশুরা প্রায়ই যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টঙ্কার, পক্ষাঘাত, হাম প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। প্রতিবছরই বহুসংখ্যক শিশু এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় অথবা পঙ্গু হয়ে যায়। অথচ প্রতিষেধক টিকাদানের মাধ্যমে শিশুকে অনায়াসেই এই সব রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়। প্রতিষেধক টিকাদানের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ একটি বিশেষ পদ্ধতি যা শিশুদের ছ'টি সংক্রামক রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। সঠিক সময়ে রোগ প্রতিরোধের টিকা নিলে নিস্তার পাওয়া যায়। তাই ছোট ছেলেমেয়েদের ও তাদের বাবা-মাদের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরী।

বিষয়

প্রতিটি রোগেরই একটি নির্দিষ্ট প্রতিষেধক টিকা আছে। প্রতিষেধক টিকা ইনজেকশনের মাধ্যমেও দেওয়া যেতে পারে, আবার খাওয়ানোও যেতে পারে। যে ছটি অতি পরিচিত এবং প্রতিরোধযোগ্য রোগের প্রতিষেধক দেওয়া প্রয়োজন সেগুলি হলঃ—

১। যক্ষ্মা
২। ডিপথেরিয়া
৩। হুপিংকাশি
৪। ধনুষ্টঙ্কার
৫। পোলিও
৬। হাম

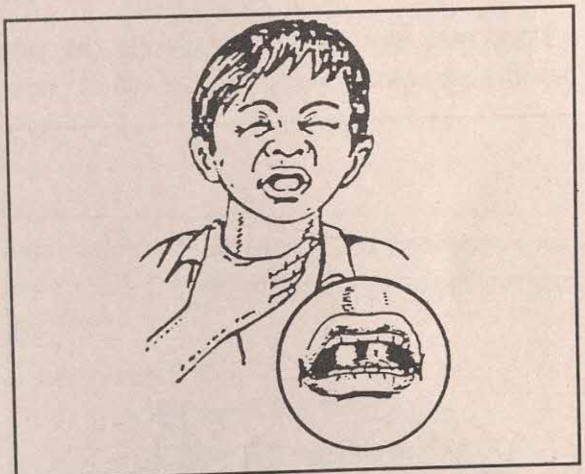
যক্ষ্মা

আমাদের দেশে ফুসফুসেই যক্ষা বেশি হয়। এছাড়া হাড়ে, গ্রন্থিতে এবং কিডনিতেও যক্ষা হয়। এই রোগের লক্ষণ হল ১৫ দিনেরও বেশি কাশি, ঘুসঘুসে জ্বর, ওজন হ্রাস পাওয়া এবং দুর্বলতা অনুভব করা। এটি একটি জীবাণুঘটিত রোগ ও ছোঁয়াচে এবং একজনের থেকে আরেকজনের মধ্যে সহজেই সংক্রামিত হতে পারে। বি.সি.জি টিকা নিলে যক্ষ্মা প্রতিরোধ করা যায়।



ডিপথেরিয়া

ডিপথেরিয়া একটি সংক্রামক রোগ, এই রোগে প্রধানত গলা আক্রান্ত হয়। এই রোগের প্রধান লক্ষণ হল জ্বর, মাথাধরা, গলায় প্রচন্ড ব্যাথা ইত্যাদি। ক্রমশ গলা থেকে ব্যথা ভেতরের ঝিল্লিতে ছড়িয়ে পড়ে, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয় এবং রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে। যদি শ্লেষ্মাতে বায়ুবিলের মুখ আটকে



যায় তবে শিশুর শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, অস্ত্রোপ্রচারের প্রয়োজন হতে পারে, একে বলে ট্র্যাকিওস্টমি (বায়ুবিল সঙ্কোচনের ফলে প্রয়োজনীয় শল্যচিকিৎসা)। সময়মত ডি.পি.টি. টিকা দিলে ডিপথেরিয়া প্রতিরোধ করা যায়। ডি.পি.টি. টিকা শুধু ডিপথেরিয়া নয় হুপিংকাশি এবং ধনুষ্টঙ্কারও প্রতিরোধ করে।

ঘুংড়িকাশি (হুপিং কাশি)

এই রোগের প্রধান লক্ষণ হল প্রচন্ড কাশি। প্রথম কদিন সাধারণ কাশি বলে মনে হয় কিন্তু ক্রমশ কাশি বাড়তে থাকে এবং



আক্রান্ত শিশু অনবরত কাশতে থাকে। কাশতে কাশতে মুখ চোখ লাল হয়ে যায় এবং বমিও করে ফেলে।

শিশুদের শ্বাস-প্রশ্বাসে প্রচন্ড কষ্ট হয়। শ্বাস নেবার সময় ঘড়ঘড় আওয়াজ বা কাশির শেষে 'হুপ' করে আওয়াজ হয় বলে একে ঘুংড়িকাশি বা হুপিংকাশি বলে। কাশতে কাশতে রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে বলে ঘন ঘন খাবারও প্রচুর পরিমাণে তরল পানীয় খাওয়ানো দরকার।

ধনুষ্টঙ্কার

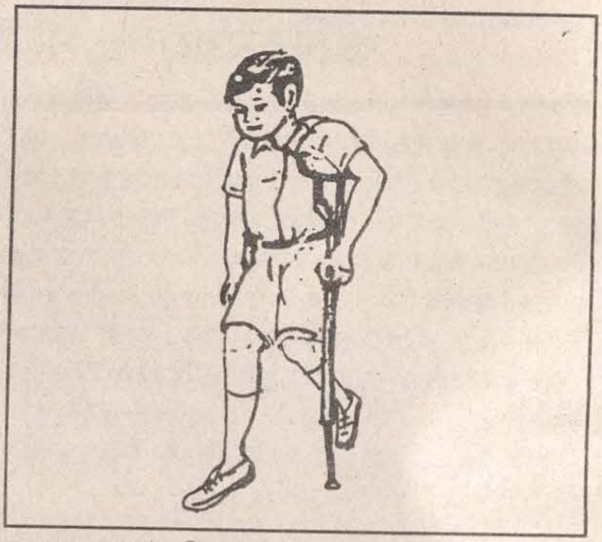
শরীরের কোন অংশ কেটে বা ছিঁড়ে গেলে সেই অংশ সংক্রমিত হয়ে ধনুষ্টঙ্কার রোগ হয়। জ্বর ও কাঁপুনি এই রোগের



প্রধান লক্ষণ। এছাড়াও সারা শরীর শক্ত হয়ে যায়। চোয়াল শক্ত হয়ে যায়, রোগী হাঁ করতে পারে না, চিবোতে বা গিলতে পারে না, পিঠটা ধনুকের মত বেঁকে যায়। ধনুষ্টঙ্কারে আক্রান্ত ব্যক্তিকে বাঁচানো খুব শক্ত। তাই ধনুষ্টঙ্কার প্রতিষেধক টিকা আগে থেকেই নিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক শিশুকেই সময় মত ডি.পি.টি. টিকা দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া শরীরের কোন অংশে সামান্য ক্ষত হলেও ক্ষতস্থান সাবান জল দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলে অ্যান্টিসেপ্টিক মলম লাগাতে হয়।

পক্ষাঘাত বা পোলিও

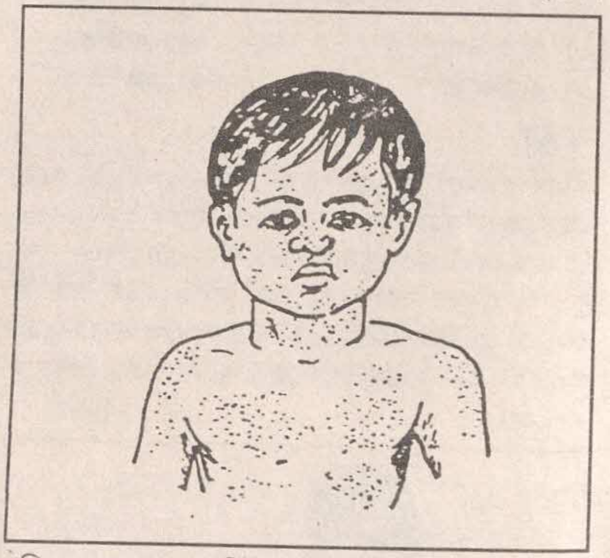
সংক্রামিত জল ও খাবারের মাধ্যমে পোলিও রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে। এটি একটি ভয়াবহ রোগ এই রোগে আক্রান্ত হলে রোগী পঙ্গু হয়ে যায়। কারও কারও আবার মৃত্যুও হয়। সুতরাং এই রোগ প্রতিরোধার্থে পোলিও প্রতিষেধক টিকা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রাথমিক পর্যায়ে পক্ষাঘাতের একমাত্র চিকিৎসা হল রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখা তারপর



অবস্থার একটু উন্নতি হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ব্যায়াম অথবা মালিশ করানো যেতে পারে।

হাম

হাম এমনই একটি ব্যাধি যা ছোটবেলায় প্রায় সব শিশুরই হয়। যদি সময়মত বি.সি.জি. টিকা দিয়ে দেওয়া যায় তবে এই রোগ



প্রতিরোধ করা যায়। সর্দি কাশির সাথে প্রচন্ড জ্বর এই রোগের লক্ষণ। তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে সারাশরীরে লাল লাল গুটি বেরোয়। গুটি বেরোবার দুদিন পরেই আবার গুটিগুলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে শুরু করে এবং তাপমাত্রাও কমতে থাকে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে বুকে কফ বসে গিয়ে নিউমোনিয়া না হয়। অনেকের আবার প্রচন্ড ডায়রিয়া হয়। কারও কারও আবার কানে সংক্রমণ হয়। হাম নিয়ে আমাদের দেশে অনেক কুসংস্কার বা ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে, যেমন কারও কারও ধারণা মা শীতলা ভর করেন, কারও কারও ধারণা হামের গুটি

যত বেরোয় তত ভাল। তাই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে রোগীকে কম্বল জড়িয়ে রাখেন যাতে হামের গুটি বেশি বেরোয়। এই সব ধারণা ভুল। সাধারণ হাম হলে কোন চিকিৎসার দরকার নেই। শুধুমাত্র ঠান্ডা নরম কাপড় দিয়ে গা মুছিয়ে দিতে হবে এবং জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটেমল দেওয়া যেতে পারে। বিশেষ কোন উপসর্গ দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

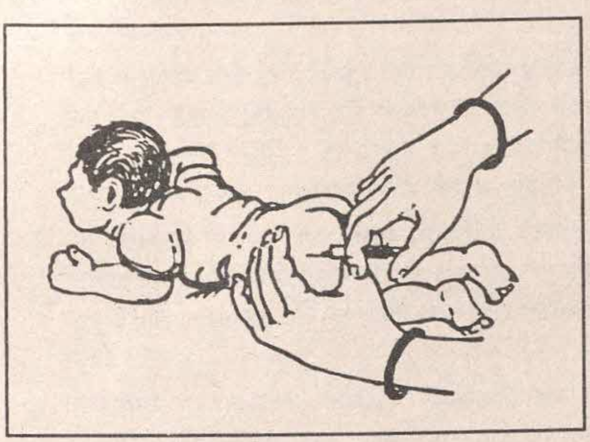
প্রতিষেধক টিকার তালিকা

রোগ প্রতিরোধের জন্য উপযুক্ত সময়ে ও বয়সে টিকা নিলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। জন্মের পরই বয়সানুযায়ী ঠিক সময়ের ব্যবধানে প্রতিষেধক টিকা নিয়ে নিতে হয়। বেশির ভাগ প্রতিষেধক টিকাই জন্মাবার একবছরের মধ্যেই দেওয়া হয়। কিছু কিছু টিকা একাধিক বার নিতে হয়।

প্রথম দুবছরের জন্য টিকাকরণের তালিকা ঃ

শিশুর জন্য

১½ মাস বয়সে	বি.সি.জি. (ইনজেকশন) ডি.পি.টি.-১ (ইনজেকশন) এবং ও.পি.ভি.-১ (ডোজ)
২½ মাস বয়সে	ডি.পি.টি.-২ (ইনজেকশন) এবং ও.পি.ভি.-২ (ডোজ)
৩½ মাস বয়সে	ডি.পি.টি.-৩ (ইনজেকশন) এবং ও.পি.ভি-৩ (ডোজ)
৯ মাস বয়সে	হামের ইনজেকশন
১৬ থেকে ২৪ মাস বয়সে	ডি.পি.টি. বুস্টার (ইনজেকশন) এবং ও.পি.ভি. বুস্টার (ডোজ)



শিশুর জন্ম কোন হাসপাতাল/ক্লিনিকে হয়ে থাকলে জন্মের পরেই বি.সি.জি. ইনজেকশন দেওয়া উচিত।

কোন একটি ইনজেকশন/ডোজ-এর ক্ষেত্রে যদি আপনি দেরিও করে ফেলেন, তবু অবশ্যই তা দিয়ে নিতে হবে। এ ব্যাপারে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করা বাঞ্ছনীয়।



বিদ্যালয়ের শিশুরা ডিপথেরিয়া ও টিটেনাসের বুস্টার ডোজ দেওয়ার জন্য টিকাকরণের উপর কোন অনুষ্ঠান চালাতে পারে।

৫ থেকে ৬ বছরের মধ্যে -

- ক) বুস্টার - ডিপথেরিয়া, টিটেনাস
- খ) টাইফয়েডের টিকা (এক মাসের ব্যবধানে)

১০ বছরের মধ্যে -

- ক) বুস্টার - টিটেনাস
- খ) বুস্টার - টাইফয়েড

শিক্ষিক-শিক্ষিকারা কীভাবে তথ্য পরিবেশন করবেন

১। শিক্ষক-শিক্ষিকারা ক্লাসরুমে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। সন্নিহিত এলাকার অথবা বিদ্যালয়ের আক্রান্ত ছেলেমেয়েদের উদাহরণ উপস্থাপিত করতে পারেন।

২। বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোন গল্প বলে শোনাতে পারেন।

৩। বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন নাটকের আয়োজন করে বিভিন্ন চরিত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে অভিনয় করানো যেতে পারে।

৪। প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রের কোন মেডিকেল অফিসারকে দিয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা শিক্ষক/শিক্ষিকারা করতে পারেন।

৫। প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রে অথবা বিদ্যালয়ে টিকা দেবার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের দেখিয়ে তাদের ব্যবহারিক জ্ঞান জন্মাতে সহায়তা করতে পারেন।

শিশুদের করণীয় বিষয়সমূহ

১। বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীর প্রতিষেধক টিকা নেওয়া হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে বয়স্ক ছেলেমেয়েরা খোঁজখবর নিতে পারে। প্রতিষেধক টিকা নিয়ে থাকলে কোন কোন রোগের প্রতিষেধক নিয়েছে সে ব্যাপারেও খোঁজ নিতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহায়তায় হেলথ রেকর্ড থেকে এসকল তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে, শ্রেণীর সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে।

২। বিদ্যালয়ের ছোট ছেলেমেয়েরা সমীক্ষা করে দেখতে পারে যে নিজ নিজ পরিবারে ও এলাকায় কতজন শিশুকে প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছে। যারা প্রতিষেধক টিকা নেয়নি, তাদের প্রতিষেধকের গুরুত্ব বোঝাতে পারে। এবং নিকটবর্তী প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রে গিয়ে প্রতিষেধক টিকা দিলে সহজেই শিশুকে এইসব বিপজ্জনক রোগের হাত থেকে রক্ষা করা যায় সে কথা বলে বোঝাতে পারে।

৩। ছোট ছেলেমেয়েরা প্রতিষেধক টিকার উপর স্লোগান লিখে অথবা প্লাকার্ড বানিয়ে প্রচার অভিযান চালাতে পারে।

মূল্যায়ন

১। শিক্ষক-শিক্ষিকারা নানারকম প্রশ্নের উপস্থাপনার মাধ্যমে দেখতে পারেন যে ছাত্রছাত্রীরা বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে কিনা এবং বিষয়টি সম্পর্কে তাদের ধারণা জন্মেছে কিনা।

২। সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের বিশ্লেষণ ও ব্যাখার মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল্যায়ন করতে পারেন যে ছেলেমেয়েদের এ বিষয়ে জ্ঞান বেড়েছে কিনা।

শিক্ষাসহায়ক উপকরণ

মানুষ তৈরির কারখানায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা শুধু কর্মীই নন তাঁরা শিল্পী। প্রকৃতির কোমল হস্তক্ষেপে ফুল যেমন আপনাকে বিকশিত করে তেমনই কচি মন উন্মোচিত হয় শিক্ষকের কোমল হস্তক্ষেপে—শিশু নিজেকে জানতে শেখে, চিনতে শেখে, একে একে জাগে নব মূল্যায়নবোধ। প্রকৃতির অফুরন্ত ভান্ডার মানুষ কাজে লাগায় আপন প্রয়োজনে—সে দেখে, শেখে। শিশু বয়স থেকে বিদ্যালয়ে যাওয়া পর্যন্ত প্রধানত সে 'দেখা'টাকেই কেন্দ্র করে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই শিশুকে 'দেখান'-ই শিক্ষকের প্রথম কাজ। কিন্তু এই প্রকৃতির বিশাল পটভূমিতে সব 'দেখা' মানুষের সাধ্যাতীত। তাই মানুষ শুধু দেখে শেখে না —সে 'দেখে'--'শুনে'—'করে'—'শেখে'।

শিক্ষা তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন শিক্ষাপ্রদ জ্ঞান শিক্ষাগ্রহণকারী সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তাধীন করে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে এবং দৈনন্দিন জীবনে তার প্রয়োগ করে। অন্যথায় শিক্ষার অপচয় ঘটে। 'দেখে'-'শুনে'—'করে' শেখাকে শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে রেখে এই অপচয় বন্ধের চেষ্টা চলছে যুগ যুগ ধরে। বর্তমান শিক্ষণ সহায়িকায় স্বাস্থ্য, সৌন্দর্যবোধ, পরিবেশ পরিষ্কার রাখা, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, খাদ্য, খাদ্যের ব্যবহার ও পুষ্টিকে যথাযথভাবে শিশুদের মনের দরজায় পৌঁছে দেবার জন্য কিছু শিক্ষামূলক 'মাধ্যমের' কথা এখানে বলা হচ্ছে যার যথাযথ প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহার কিশলয়কে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার রসদ জোগাতে পারবে--জাগাবে জীবনের নূতন মূল্যবোধ।

এই 'মাধ্যম' ব্যবহার প্রসঙ্গে আমাদের কতকগুলি বিষয়ের প্রতি নজর রাখা কর্তব্য ঃ—

১) যিনি পড়াবেন তাঁর সেই বিষয়ে শুধুমাত্র জ্ঞান থাকলে চলবে না, তাঁর ঐ বিষয়ের প্রতি সহজাত অনুরাগ থাকা চাই, তাহলেই তিনি শিশুদের মনে প্রয়োজনীয় 'উপকরণ' দ্বারা সত্যকার জ্ঞান সঞ্চার করতে পারবেন।

২) এই উপকরণ উপস্থাপনার পূর্বে শিক্ষার্থীর বয়স ও শিক্ষাগত মানের কথা মনে রাখতে হবে এবং মনে রাখতে হবে উপকরণের বাহুল্যে বিষয়বস্তুটি যেন চাপা পড়ে না যায়।

৩) শিক্ষার্থীরা উপকরণের মাধ্যমে বিষয়বস্তুটি সম্যক উপলব্ধি করতে পারছে কিনা খেয়াল রেখে প্রয়োজন মত শিক্ষাদানের 'কৌশলকে' পাল্টাতে বা নতুন কিছু সংযোজন করতে হবে।

৪) শিক্ষাদানকালে উপকরণের সাহায্যে শিক্ষক-শিক্ষিকা বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয় সাধনের দিকে সচেতন দৃষ্টি রাখবেন।

৫) ব্যয় বাহুল্য সর্বক্ষেত্রেই বর্জন করতে সচেষ্ট থাকবেন। বিভিন্ন শ্রেণীতে একই উপকরণের মাধ্যমে বিষয়বস্তুটি বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে যেমন,—প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষক-শিক্ষিকা কিছু সময়কালীন ফল ও সব্জি এনে তাদের কোনটা কি ফল বা সব্জি — খেতে কেমন — খেলে কি হয় — কোন ঋতুতে এসব পাওয়া যায় ইত্যাদি প্রশ্নের মাধ্যমে ঐ সব খাদ্যের গুণাগুণ — ব্যবহার প্রণালী বিভিন্ন খাদ্য পরিচিতির সম্বন্ধে পাঠদান করতে পারেন। পরে ক্রমোন্নত মান অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি দিনের খাদ্যতালিকার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে কোনটা কোন জাতীয় খাদ্য, তাদের উপকারিতা —বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টি অনুযায়ী সমন্বয় সাধন করেও দেখাতে পারেন। হাতের কাজের মাধ্যমে মাটির ফল সব্জি ইত্যাদি তৈরি অনুযায়ী বর্ণানুক্রমে সংগ্রহশালায় রাখা যেতে পারে। বিভিন্ন মান অনুযায়ী বিভিন্ন বয়সের চার্ট দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা যায়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-সহায়ক-উপকরণ সম্বন্ধে এবার কিছু আলোচনা করা যাক —

মধ্যাহ্ন আহার

বর্তমানে অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা আছে। কোন শিক্ষকের দায়িত্বে শিশুদের সামনেই যদি এই খাদ্য প্রস্তুত করা হয় তবে খাদ্যের সুষ্ঠ রন্ধন প্রণালী-গুণাগুণ-পুষ্টি ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সম্যক ধারণা জন্মে। শুধু তাই নয়, তারা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানেই ঐ খাদ্য সুষ্ঠভাবে গ্রহণ করতে পারে — অর্থাৎ কিভাবে খাওয়া উচিত —খাওয়ার আগে ও পরে কি কি স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ পালন করবে তাও আয়ত্ত করতে পারে।

বিদ্যালয়ে বাগান

বিদ্যালয়ে বাগানের মাধ্যমে তারা ঐ খাদ্যবস্তুর কোন কোন অংশ উৎপন্ন করার প্রণালী—ঐ মাটির উর্বরতা সম্বন্ধে জ্ঞান, বীজকরণ, রোপন, বপন ইত্যাদি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভও করে। শিক্ষক-শিক্ষিকার সহায়তায় নিজের হাতে কাজ করার জন্যই তাদের ঐ সব বিষয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমে ক্রমে এটা স্বভাবজাত হয়। এইভাবে গৃহেও ছোট ছোট বাগানের মাধ্যমে পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা যায়। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের স্থানাভাবে টবে বাগান, গ্লাসের বাগান ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের উৎসাহিত করা যেতে পারে।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা বনভোজন

শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা বনভোজনের মাধ্যমেও স্বাস্থ্য, পুষ্টি,

সৌন্দর্যবোধ, বিভিন্ন পরিবেশ ও তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক জ্ঞানদান করা যায়। তাদের যদি মাঝে মাঝে নিকটবর্তী খামার, গোলবাড়ি বা ফুলের বাগানে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, খাদ্যের গুণাগুণ, কোন কোন ফসল ঐ এলাকায় বেশি উৎপাদিত হয়—খাদ্য সহজ উপায়ে কিভাবে গ্রহণ করা যায়—ইত্যাদির ধারণা দেওয়া যায়। ইহা ব্যতীত পশুপালন, হাঁসমুরগী পালন, মৌমাছি সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ের আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়। ডিম, দুধ, মধু, মাছ, ফল-মূল ইত্যাদি যে সুস্বাস্থ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন এ সম্বন্ধে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট হয় এবং এসব উৎপাদন করাও যে কষ্টসাধ্য নয় এ বোধ জন্মে, শিশু বয়স থেকে এভাবে উৎসাহ সৃষ্টি করে তাদের গৃহেও ঐ সব কাজে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

ব্লাকবোর্ড বা সবুজবোর্ড

যে সমস্ত বিদ্যালয়ে অন্যান্য সামগ্রীর অভাব সেখানে 'ব্লাকবোড' বা 'সবুজবোর্ড' শিক্ষক-শিক্ষিকার নিকট ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ। তাঁরা নানারকম চিত্র এঁকে, বিভিন্ন রঙ্গীন 'চক' ব্যবহারের দ্বারা নকসা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুটি উপলব্ধি করাতে সাহায্য করতে পারেন। 'বোর্ড'কে এককথায় প্রথম ও প্রধান উপকরণ বলা যায়। এর যথাযথ ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সচেতন থাকবেন। শিক্ষক-শিক্ষিকারা যখন যে বিষয় পড়ান-না কেন তিনি সেই বিষয়ের উপরেই বোর্ডে ছবি এঁকে, নকসা করে জ্ঞান দান করতে পারেন এবং ঐ বিষয়ের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারেন, যেমন ড্রয়িং-এর ক্লাসে তিনি পশুপাখি, ফলমূল ইত্যাদি যা কিছুই আঁকান-না কেন তার থেকে পুষ্টি সম্পর্কিত আমরা কী কী পেতে পারি কিভাবে পেতে পারি এবং কোথায় পেতে পারি—তিনি বোর্ডে এঁকে-লিখে বোঝাতে পারেন। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা অধিক সুস্পষ্ট হয়।

চার্ট

পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষায় চার্ট একটি অতি ব্যবহৃত সুন্দর উপকরণ। অতি সহজে চার্টের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়বস্তু এঁকে-লিখে বা নক্সার সাহায্যে বোঝাতে পারেন। তবে চার্ট প্রস্তুত করার সময় যে বিষয়টির উপর চার্ট করবেন তা যেন সুস্পষ্ট ও শ্রেণী-উপযোগী হয়।

ফ্ল্যাস কার্ড

ফ্ল্যাসে কার্ডের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী যে কোন বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বা নিয়মানুবর্তিতার সাথে কোন কাজের পর কোন কাজ করবে তা শিখতে পারে, মধ্যাহ্ন-আহারের ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা হাত-মুখ ধোওয়া, বসা, খাবার গ্রহণ, খাওয়া, খাওয়ার পরে নিজেকে পরিষ্কার রাখা, স্থান, বাসন ইত্যাদি পরিষ্কার করা, যথাযথভাবে গুছিয়ে রাখা শিখতে পারে। ছোট ছোট কার্ডে কাজের নমুনাগুলি চিত্রিত করে তাদের মাঝে ছড়িয়ে দিলে অতি সহজেই তারা এগুলিতে অভ্যস্ত হবে।

মডেল

খাদ্যে গুণাগুণ অনুযায়ী বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর মডেল প্রস্তুত করে তারা সংগ্রহশালায় রাখতে পারে।

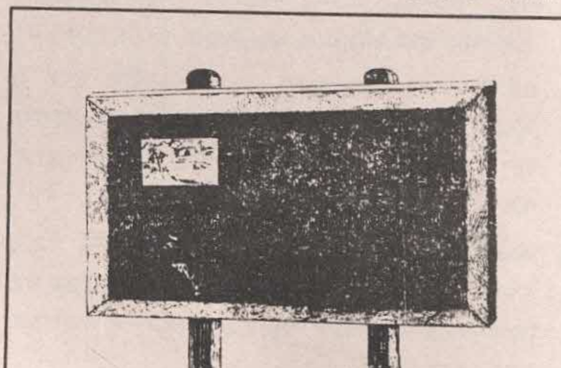
এগুলি প্রদর্শনীতে সাজিয়ে সকল দর্শককে বোঝানোর মধ্য দিয়ে ঐ বিষয়ে তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাড়ে। এই মডেল মাটি, চায়না-ক্লে, পেপার পাল্প, প্যারিস প্লাস্টারের সাহায্যে প্রস্তুত করা যায়।

খবরাখবর সম্বলিত বোর্ড (ইনফরমেশন বোর্ড)

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে অংশ বিশেষ যেমন—স্বাস্থ্যপালনবিধি, খাদ্যের গুণাগুণ, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখায় সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য, পুষ্টির অভাবে আমাদের কী কী হতে পারে, সহজ ও সাধারণ কোন বস্তু আমাদের পুষ্টি যোগায় প্রভৃতি বিষয় কেটে নিয়ে ঐ বোর্ডে টাঙিয়ে রাখা যায়। এটা সর্বদা শিক্ষার্থীদের চোখের সামনে থাকায় দেখতে দেখতে, পড়তে পড়তে অতি সহজেই তাদের অবচেতন মনে ছাপ রাখে। মানসিক উৎকর্ষতার বৃদ্ধি ঘটায়। তুলনামূলকভাবে নিজেদের যাচাই করতে শেখে এবং নূতনভাবে ভাবতে শেখে। সু-অভ্যাস গঠনে এটা একান্ত কার্যকরী।

ফ্লানেল বোর্ড

কাঠের ফ্রেমের মাঝে ফ্লানেল কাপড়ের টুকরো সেঁটে এই বোর্ড তৈরি হয়। সাধারণত ৩০" x ২০" মাপে এটা করা যেতে পারে। মাঠে অগ্রসর হওয়াকালীন বোর্ডের বিষয়বস্তু

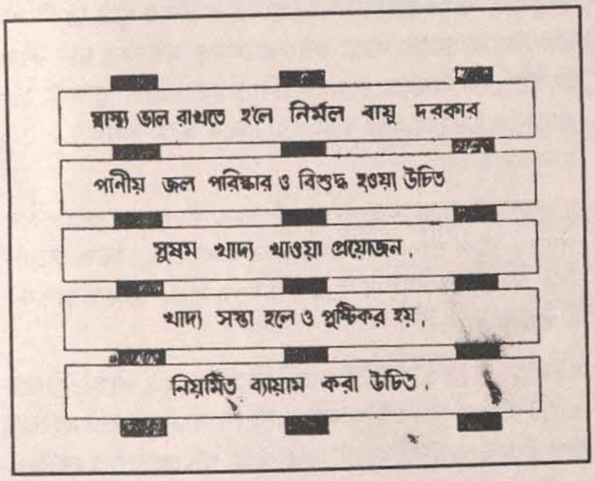


পালটায়। সাধারণত বোর্ড বার বার মুছে দেওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের মনঃসংযোগের ব্যাঘাত ঘটে এবং বিষয়বস্তুটি সম্পূর্ণভাবে চোখের সামনে না থাকায় ঐ বিষয়বস্তুর ধারণা ছাত্রছাত্রীদের মনে দানা বাঁধে না। কিন্তু ফ্লানেল বোর্ডে পাঠ অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বস্তুটির চিত্র আটকিয়ে দিলে সবটাই একসাথে তাদের চোখের সামনে থাকে। ফলে একাগ্রতা বাড়ায় এবং বিষয়বস্তুটির ধারণা সুস্পষ্ট হয় এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার পরিশ্রম বাঁচায়। এটা টাঙানোর সময় চিত্রের পিছনে টুকরো শিরিষ কাগজ সেঁটে নেওয়া যেতে পারে।

এবার শিক্ষক-শিক্ষিকার সুবিধার্থে কিছু চার্টের নমুনা দেওয়া হল —

ফোল্ডিং চার্ট

অতি সহজভাবেই এর দ্বারা বিষয়বস্তুটিকে শ্রেণীর সামনে উপস্থাপনা করা যায় বা একটি অংশ দেখিয়ে অপর অংশে কি থাকা উচিত —এই প্রশ্ন রাখা যায়। ফলে এই চার্ট পাঠদান ও প্রয়োগে সমান সাহায্য করে। ১০" x ৪" সাদা কাগজে বিষয়বস্তুগুলি পরিষ্কার করে লিখতে হবে। ঐ কাগজের পিছনে ২" কাগজে (একটু মোটা হলে ভালো হয়) আড়াআড়িভাবে লাগাতে হবে। চার্টটি ভাঁজ করে বোর্ডে টাঙিয়ে দিয়ে যখন পড়াতে হবে তখন সেই অংশ উপস্থিত করতে হবে।



সাসপেন্স চার্ট

এখানে একটি চার্টে পাঠের অন্তর্ভুক্ত একটি অংশ খোলা রেখে বাকী অংশগুলো ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। প্রয়োজনানুযায়ী পাঠ অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ অংশগুলি একে একে উন্মোচন করতে হবে। সম্পূর্ণ অংশটি একই সাঙ্গে দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় শিক্ষকের পাঠদানের অংশটির উপরে শিক্ষার্থীর মনঃসংযোগ ঘটায়—আগ্রহ বৃদ্ধি করায়, কৌতুহল জায়গায় ও চিন্তা শক্তি বাড়ায়।

সাধারণত এই চার্ট ২০" x ৩০" হয়। প্রয়োজনে রদবদল চলে। লিখিত অংশ ঢাকা দেওয়ার জন্যে টিসু বা পাতলা কাগজ ব্যবহার করা যায়। যে অংশটি শিক্ষার্থীদের অগোচরে রাখার দরকার হবে এ অংশের পরে কাগজের ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। পাঠ অগ্রসর হওয়াকালীন একে একে শিক্ষার্থীদের সামনে উন্মোচিত হবে। এইভাবে থাকাকালীন একে একে প্রয়োগের কাজে এই উপায়ে শূন্যস্থান পূরণের মাধ্যমে তাদের অগ্রসরতা সম্বন্ধে পরীক্ষা নেওয়া যায়।

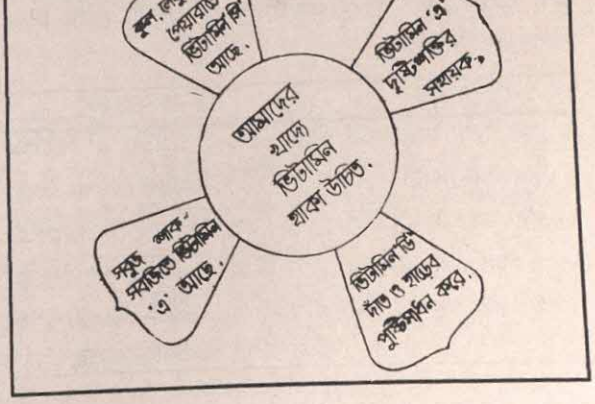
ফুলের চার্ট

শিশুরা ফুল ভালোবাসে। তাই ফুলের আকারে চার্ট তৈরি করে তাদের সামনে উপস্থাপন করলে সহজেই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটা প্রস্তুত করতে দরকার ভাঁজ করা যায় এমন কাগজ। মাপ— ফুলের বৃত্ত ৬", পাপড়ি ৫১/২",। মাঝের অংশটিকে বৃত্তাকারে রেখে চারিপাশের পাপড়গুলি কাটতে হবে। প্রয়োজনানুসারে ৪ টি বা ৬ টি পাপড়ি রাখতে হবে। এই পাপড়িগুলিতে পুষ্টিবিষয়ক বিবরণ, বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ ইত্যাদি লিখে পাপড়িগুলি একে একে শিক্ষার্থীদের সামনে উন্মুক্ত করে শিক্ষা দেওয়া যায়, এটি খুব চিত্তাকর্ষক।

এইভাবে একটি একটি পাপড়ি খুলে শিক্ষক-শিক্ষিকা পাঠে অগ্রসর হবেন। অনস্ফুট পাঠ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে প্রস্ফুটিত হবে।

ফ্লো চার্ট (টেবিল ক্যালেন্ডারের ন্যায় চার্ট)

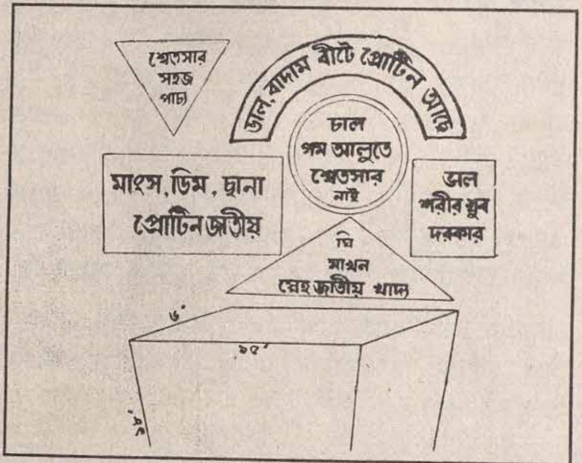
এটা আর্ট পেপার দ্বারা প্রস্তুত করতে হবে। এই চার্টে ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠার ন্যায় অনেকগুলি পৃষ্ঠা থাকবে। উপরে যে বিষয়টি পড়ান হবে তার মূল বক্তব্যটি এঁকে এবং লিখে রাখা হবে। ভেতরের পৃষ্ঠাগুলিতে এ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়. এঁকে, লিখে দেখান থাকবে। শিক্ষক শিক্ষিকা শ্রেণীকক্ষে



এটির মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন। এটিও চিত্তাকর্ষক ও আগ্রহ-সৃষ্টিকারী উপকরণ।

ম্যাজিক বাক্স

কার্ড বোর্ড দ্বারা একটি বাক্স তৈরি করতে হবে। নানা আকারের রঙিন কাগজে পুষ্টি সংক্রান্ত বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক বিষয় ইত্যাদি লিখে—প্রয়োজন স্থলে এঁকে ঐ বাক্সে রাখা হবে। শিক্ষার্থী এক একটি কার্ড তুলবে শিক্ষক-শিক্ষিকা সেই বিষয়ে পাঠদান করবেন। এটার মধ্যে খেলার ভাব থাকায় পাঠ মনঃগ্রাহী হয়—শিশুরা আনন্দের সাঙ্গে শেখে বলে সহজেই মনে ছাপ রাখে।



শিশুদের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য এই কাগজের টুকরাগুলি বিভিন্ন আকারের করা যায়। বিভিন্ন আকারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গাণিতিক ধারণা লাভ করে। প্রয়োজনবোধে রঙ পেনসিল, মার্বল পেপার ব্যবহার করা যায়। পরে ঐগুলির দ্বারা বই প্রস্তুত করে সংগ্রহশালায় রাখা যায়।

কার্ডবাক্স

মোটা কাগজে তাসের প্যাকেটের ন্যায় তৈরি করে তার ভিতর ছোট ছোট (৩" X ২") মাপের কাগজে বিভিন্ন বিষয় লিখে ২টি প্যাকেট করবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঐ প্যাকেট দুটি দিয়ে একের সংযোগকারী অপর কার্ডটি বেছে নিতে বলবেন। যেমন ঃ—

১নং প্যাকেট	২ নং প্যাকেট
১। "এ" ভিটামিন চোখ ভাল হয়	১। গাজরে 'এ' ভিটামিন আছে।
২। জল রক্ত সঞ্চালনে সাহায্য করে।	২। বিশুদ্ধ জল পান করা উচিত।
৩। 'সি' ভিটামিন ত্বক ভালো রাখে	৩। লেবুতে 'সি' ভিটামিন আছে।
৪। প্রোটিন দেহ গঠন করে	৪। মাছ, মাংসে প্রোটিন আছে।
৫। ভিটামিন 'বি' পুষ্টি জোগায়	৫। সবুজ শাকসব্জিতে 'বি' ভিটামিন আছে।

এইভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্নভাবে নানা ধরনের চার্টের মাধ্যমে পাঠদান করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানকে দৃঢ় করতে পারেন।

শিক্ষা-সহায়ক হিসাবে বর্তমানে আরও অনেক উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, ম্যাজিক লণ্ঠন, রেডিও, টেপরেকর্ডার, টেলিভিসান, চলচ্চিত্র, নৃত্যগীত, পুতুলনাচ ইত্যাদি।

বিভিন্ন বিষয়ে ধারাবাহিক 'স্লাইড' তৈরি করে নিয়ে ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইড প্রজেক্টার-এর সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরা যায় তাহলে শিক্ষার্থীরা আনন্দের মধ্য দিয়ে বিষয়টি জানতে ও শিখতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীকক্ষে ঘর অন্ধকার করে মসৃণ দেওয়ালের উপর ছবি ফেলে দেখান যেতে পারে। এইভাবে একবার স্লাইড করে নিলে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরা যায়।

প্রজেক্টারের মাধ্যমেও বিভিন্ন পরিবেশের, বিভিন্ন জাতির খাদ্য, রন্ধন প্রণালী, দৈনন্দিন জীবনধারার ছবি তুলে এনে ছাত্র-ছাত্রীদের দেখান যেতে পারে। এর দ্বারা খাদ্যতালিকায় বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন আনা যায়, জীবনধারনের মান উন্নত করা যায়, সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে—নিজের দেশ সম্বন্ধে শিশু বয়স থেকেই শিক্ষার্থী সচেতন হয়।

পুষ্টি-বিষয়ক পরিবেশ, পরিষ্কার-বিষয়ক, ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্য-সংক্রামক ব্যাধি ইত্যাদি সম্বন্ধে নাটক লিখে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা করান যেতে পারে এবং এ সমস্ত নাটকের ছবি তুলে প্রজেক্টারের মাধ্যমে দেখালে বিষয়গত ধারণা সুস্পষ্ট হয়, আনন্দ ও উৎসাহ বৃদ্ধি করে এবং ক্রমে ক্রমে বিষয়টি তাদের স্বভাবজাত হয়।

পুতুলনাচের মাধ্যমেও ঐসমস্ত বিষয়গুলি সঞ্চার করা যেতে পারে। টেপ রেকর্ডারে বিষয়গত কথা, গল্প, নাটক ইত্যাদি ধরে রেখে শিক্ষার্থীদের পরে শোনানো যায়। এটা চিত্তাকর্ষক ও আনন্দদায়ক।

বর্তমানে রেডিও, টেলিভিসান, চলচ্চিত্র এই শিক্ষা বিষয়ে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। যা মনোজগতে সহজেই ছাপ ফেলে তাই চিরস্থায়ী হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে রেডিও, চলচ্চিত্র ও টেলিভিসান আমাদের শিক্ষার অপরিহার্য অংশ। এর দ্বারা শুধুমাত্র নিজের দেশ নয়, নানা দেশের নানা খবর চোখের সামনে ধরা পড়ে। ফলে, তুলনামূলকভাবে বিষয়টির অনুধাবন করা যায়। চিন্তাশক্তি, বিচার-বিবেচনা বৃদ্ধি করে, কাজে আগ্রহ সৃষ্টি করে, নতুন নতুন উদ্ভাবনে সাহায্য করে।

উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষক কম কথায়, একই পরিশ্রমে সহজে বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করতে পারেন। শিক্ষা মনঃগ্রাহী হয় এবং শিশুদের কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় অধিক উৎসাহী করে তোলে।

আমাদের কাজ

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন একটি মুনাফা বিহীন রেজিষ্ট্রীকৃত সংস্থা। এর জন্ম ১৯৭৪ সালে। এই সংস্থা দিল্লীতে অবস্থিত ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন অব্ ইন্ডিয়া (ভিহাই) এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যশাখা। ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই এই সংস্থার রাজ্যভিত্তিক কার্যালয় আছে। এই কার্যালয়গুলি সারা ভারতের স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং শিক্ষাবিষয়ক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত এরূপ ১০,০০০ এরও বেশী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছে।

ডবলু-বি-ভি-এইচ-এ অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গের ১০০০ এর বেশী স্বেচ্ছাসেবী-সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এবং ৫০০০ এরও বেশী বিদ্যালয়ের মধ্যে যোগাযোগ রেখে চলেছে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে শহরে ও গ্রামে সাধারণ মানুষের মধ্যে কাজ করছে।

ডবলু. বি. ভি. এইচ. এ. কি কি কাজ কিভাবে করে থাকে :

১। যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী-সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান সামাজিক উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন রকম কর্মসূচী নিয়ে কাজ করছেন-তাদের কাজগুলি কিরূপ হওয়া উচিত বা যা হচ্ছে তাকে আরো ভালো কি করে করা যায় এবং কাজের মূল্যায়ণ কিভাবে করতে হয় ইত্যাদি বিষয়ের উপর তাদের ডবলু. বি. ভি. এইচ. এ. "কনসালটেন্সী ইউনিটের" মাধ্যমে সুপরামর্শ দেবার চেষ্টা করে। প্রয়োজনে পরিদর্শকের ভূমিকা নিয়ে থাকে সংস্থার তরফ থেকে অনুরোধের আমন্ত্রণ পেলে।

২। এমন অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান আছে যারা হয়তো সঠিকভাবে জানেন না কিভাবে "প্রজেক্ট-প্রপোজাল" লিখতে হয় বা সরকারী-বেসরকারী কত ধরণের স্কীম আছে সেবামূলক কাজের জন্য।--এসব ক্ষেত্রে সংস্থাগুলি যদি এগিয়ে আসেন সহযোগিতা পাবার জন্য, তবে ডবলু. বি. ভি. এইচ. এ. তাদের **"যোগাযোগ"** বিভাগের মাধ্যমে যোগাযোগ করিয়ে দেবার সাথে সাথে অনুরোধ থাকলে "প্রজেক্ট-প্রপোজালও" কিভাবে করতে হয় তা দেখিয়ে দেন এবং প্রয়োজনে তা লিখে দিয়ে থাকেন। এছাড়াও সরকারী-বেসরকারী অর্থিক অনুদান কিভাবে কোথা থেকে পাওয়া যেতে পারে তার ঠিকানা ও পথও বলে দিয়ে থাকে।

৩। ডবলু. বি. ভি. এইচ. এ.-এর "তথ্যবিভাগ" থেকে স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য ছাড়াও আলাদা আলাদা করে বিভিন্ন বিশেষ রোগের উপর পেপারকাটিং ও দেশ-বিদেশের জার্নাল পাওয়া যায়।-এছাড়াও আমাদের সামাজিক স্বাস্থ্যের দুষণ সংক্রান্ত "খবরও" রাখার চেষ্টা করা হয়। এর সাথে একটি ছোট লাইব্রেরী আছে যেখান থেকে আপনি স্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন বই পেতে পারেন তথ্যের প্রয়োজনে।

৪। "প্রকাশনা ও প্রচারবিভাগ" ডবলু. বি. ভি. এইচ. এ.-তাদের সাধ্য ও সামর্থ অনুযায়ী স্বাস্থ্য বিষয়ক ও সমাজ-সচেতনমূলক বই পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও প্রচার করে থাকে। যেমন, ইতমধ্যে প্রকাশিত "যেখানে ডাক্তার নেই" বইটি স্বাস্থ্যশিক্ষার হাতিয়ার হিসাবে আপামর জনসাধারণের মধ্যে সমাদরে গৃহীত

হয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্যবিষয়ক বহু বই প্রকাশ করা হয়েছে। আরো অনেক বই প্রকাশনার পথে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাঃ শক্তি ঘোষের "ইউ এন্ড ইওর চাইল্ড" এর বংলা অনুবাদ "আপনি ও আপনার শিশু" ছাপার পথে। বর্তমানে মৃত্যুরূপে ভয়াবহ "এডস" রোগের বিরুদ্ধে মানুষকে "এডস" সম্পর্কে সচেতন করার সাথে সাথে "এডস" উপর সহজ বাংলায় একটি বইও প্রকাশ করেছে।–এছাড়াও প্রতি দুমাস অন্তর ডবলু. বি. ভি. এইচ. এ. এর প্রকাশনা বিভাগ থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশ হয় "হেলথ নিউজ" (ইং) "স্কুল হেলথ মিরর" বা বিদ্যালয় স্বাস্থ্য দর্পণ (ইং ও বাং) এবং "আমাদের চিঠি আপনার নামে" (বাংলা)। "আমাদের চিঠি আপনার নামে"–পত্রিকাটি পশ্চিমবঙ্গের ১০ হাজার স্বাস্থ্যকর্মীকে বিনামূল্যে দেওয়া হয় স্বাস্থ্য শিক্ষার সহায়ক হিসাবে। "স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অনুরোধেও মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিশেষ বিষয়ের উপর পুস্তিকা প্রচার করা হয়।

৫। "বুক সেল ইউনিট"– ডবলু. বি. ভি. এইচ. এ. –এর নিজস্ব প্রকাশনা ছাড়াও কেন্দ্রীয় অফিস ভি. এইচ. এ. আই. এবং অন্যান্য অনেক সংস্থার স্বাস্থবিষয়ক বই "বুক সেল ইউনিটের" মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে পাওয়া যায়। এছাড়াও এই ইউনিটে শ্লাইড, ফ্ল্যাশ কার্ড, হেলথ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট ও পোষ্টার পাওয়া যায়।

৬। ডবলু. বি. ভি. এইচ. এ. বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্যবিষয়ক পোষ্টার, দেশ ও বিদেশের কিছু পত্রিকা (আমদানী অনুযায়ী), সরকারী পোষ্টার, পত্রিকা ইত্যাদি বিনামূল্যে সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কাজের সুবিধার জন্য দিয়ে থাকে এছাড়াও বিভিন্ন ধরণের ভিডিও ক্যাসেট (স্বাস্থ্যবিষয়ক) ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়ে থাকে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ওয়ার্কশপ, এগজিবিশন, প্রশিক্ষণ ও হেলথ্ ফেয়ার উপলক্ষে।

৭। ডবলু. বি. ভি. এইচ. এ. বিভিন্ন বন্ধু সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে "হেলথ এডুকেশন দেবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ, এগজিবিশন ও হেলথ্ ফেয়ারে যোগ দিয়ে থাকে এছাড়াও ডবলু. বি. ভি. এইচ. এ. এধরনের বহু প্রোগাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে একযোগে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কাজ করে। নীতি নির্দ্ধারিকের কাজও করে। যেমন "জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির" খসড়া তৈরী করা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য–অধিকর্তা–সচিব ও বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে যা যাবে কেন্দ্রীয় অফিস ভি. এইচ. এ. আই. –এর মাধ্যমে ভারত সরকারের কাছে।

For the initiation and Promotion of Health Education through Child-to-child programme at your institution please get in touch with :

SCHOOL HEALTH UNIT
West Bengal Voluntary Health Association
48, Gorachand Road,
Calcutta-700 014
Phones : 244-9077, 244-6754